

আমি এখন আন্ডারগ্রাউণ্ডে

উদয়ন ঘোষ

[উদয়নের এই লেখাটি দু'টি কিস্তিতে ছাপা হবে। এবার প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হল। ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক লেখা ছাপা হওয়া কাম্য নয়। পুরো লেখাটি লেখক এখনও শেষ করতে পারেননি, তাই এই ব্যবস্থা। —সম্পাদক]

প্রথম অধ্যায়

চারিদিকে, নীল সাগর, ডাকে, শুনি।

পাঠক, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি প্রকৃতই আমার নীলিমা, প্রিয় অভিভাবিকার মতো মনে হয় আপনাকে। বস্তুত, আপনি আমার শিশুশিক্ষা, যৌবনের উপবন, বার্ষিক্যের বারাগসী। আপনি—আমি আইডেনটিক্যাল, আবার এলিয়েনেটেডও। না হলে আপনার জন্য এই লেখার কোনো প্রয়োজন থাকত কি? আমরা তো কবেই আথেন্সের উপকণ্ঠ আকাদেমি-উদ্যান থেকে স্বভাব-কবিকে নির্বাসন দিয়েছি। স্থান দি'নি তো ইউটোপিয়ায়। অভিযান্ত্রিক জরুরী, আর অভিযান্ত্রিক মানেই তো আপনি, তাই না? আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

নিবেদন এই যে, বেশ কিছুদিন হল 'আমি এখন আন্ডারগ্রাউণ্ডে' নামে এক লেখা পাই এক একাজিকিউর্টিভ ডাইরীর পাতায়, তাঁরই ডেথবেডে, লুন্স্বিনী পাকে^১। পাঠক, এই লেখা তারই অনুলেখন মাত্র। ঘটনা ও চরিত্র রিয়াল, তাই কাল্পনিক^২ নাম রেখেছি।

'আমি এখন আন্ডারগ্রাউণ্ডে'

আমি এখন আন্ডারগ্রাউণ্ডে। যাঁর পাতায় লিখে যাব বলে আজ কলম ধরেছি, তিনি

১. তুলনীয়: 'আমরা কল্পনা করি নানা দৃশ্য নানান চেহারা / এ হল কল্পনালোক, কল্পনালোকের সব প্রাণীরা জীবিত। / ...এমনকি একজন ব্যক্তিকে কল্পনালোকে, স্বপ্নলোকে, ইহলোকে দেখে নাকি মানুষেরা।'

'...কল্পনা করার চেষ্টা করি আমি একটা গরুর ছটা শিঙ / এ দৃশ্য কল্পনা করা সম্ভব হল না; একজন / মানুষের বুকে এক হাত আছে গলার নীচেই / এ দৃশ্য কল্পনা করা কখনো সম্ভব নয়, ফলে / বোঝা যায় যা নেই তা কখনো কল্পনা করা সম্ভব নয় হে! / শুধুমাত্র যা আছে তা কল্পনায় দেখাই সম্ভব। / এর বিপরীতভাবে যা সব কল্পনা করি তাই সব আছে।'

বিনয় মজুমদারের কবিতার দুটি উদ্ধৃতির 'কল্পনালোক', 'ইহলোক' তথা 'কল্পনা' আশা করি পাঠক বুঝবেন। বিনয় মজুমদারের উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটির নিম্নরেখ টানা সম্পাদকের একধরনের পাঠ-নির্দেশ। সম্পাদক: উদয়ন ঘোষ।

একজন একজিকিউটিভ, লাল ভেলভেটের জ্যাকেটে কেমন যেন স্পর্শসুখ লাগে। বিপদ এই যে, যে কোনো এলাইট একজিকিউটিভ বস্তুই, আচার্ষিতে, সারফেসে এসে যান। কিন্তু এটা যেহেতু আমার আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াক, তাই এঁকে পেয়েই আমি বেশ গোলে পড়েছিলাম। লিখে-টিকে রাখি কোথায়? উপরন্তু আমি নিজে দেখতে ভালো না, আমার মণিবন্ধ এত রোগা যে, কেবল আমার লিকলিকে লিঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্য পেয়ে যাই। তাই আমার হাতে এই ডাইরী মোটেই সোনার হাতে হল না, সোনার কাঁকন যদিও তিনি, তবু, বাস্তবিক, কে কার অলংকারও হল না। এঁকে আমি লিখে-টিকে রাখি কোথায়?

আমার আন্ডারগ্রাউন্ডেই রাখি।

আমার আন্ডারগ্রাউন্ডের জীবন-যাপন শুরুর হয়েছে, সেই ১৯৫১ থেকে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে সবে তখন মামাবাড়ি শিলিগুড়ি গেছি। নেই আমার চেয়ে কানা মামা ভালো হলেও আমার এই সবেধন নীলমণি মামার ইনার-আই আছে। তাঁরই প্যাকেট থেকে চুপিসারে সিগারেট নিয়ে সেই সাতসকালে পায়খানায় গিয়ে সুখটান দিয়েছি সবে, অমনি ইনার-আই 'বন্ধঘরে সিগারেট খেতে নেই, ওতে কার্বন মোনোক্সাইড/ডায়োক্সাইড জমে তোকে শেষ করবে।' শুন্য রম্যাত মণিগত তুচ্ছ কাম্যন্যাত হয় ন্যস্ত তস্মৈ

সেইদিন থেকে আমি অদ্যাপি, সবরকম ওয়াটার-ক্লোজেটে, বন্ধঘরে, যতক্ষণ থাকি একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাই।

থাকি তখন কৃষ্ণনগরে। এখানে একদা আমি বাস্তবিক এক নকশালী আন্ডারগ্রাউন্ড দেখি। অবশ্য তার চেয়েও প্রকৃত নকশালী আন্ডারগ্রাউন্ড দেখি আমি বীরভূমের জঙ্গলে। সে কথা পরে লিখব।

এখন লেখার এই যে, আমি আমার এই লেখা কোথায় লুকিয়ে রাখছি। যাতে কেউ দেখতে না পায়। অন্যের ডাইরী না দেখার কোড অফ কনডাক্ট আমার বাড়িতে কারুর নেই। বরং আমার বাড়ির লোক খোঁজে, কে আমাকে চিঠি দিল, আমি কাকে চিঠি লিখছি, অথচ শেষ না করে রেখে দিয়েছি, পরে গেছি ভুলে, এমন চিঠি দেখেছে আমার স্ত্রীও। বিবাহের পর থেকেই তার ঐ খোঁজ। মাঝে মাঝে ভাবি, আমার স্ত্রী বিলক্ষণ লিখতে পারতেন *Discovery of my Husband*. না, পারতেন না। আমাকে আবিষ্কার করা বড় কঠিন। কেননা আমার আন্ডারগ্রাউন্ড আছে। আমি বেশির ভাগ সময় আন্ডারগ্রাউন্ডেই থাকি। সারফেসে আমাকে পেলেও আমি হয়ত তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে। আমার আন্ডারগ্রাউন্ড অবশ্য বাস্তবিক নয়। তবু, হ্যাঁ, আমি, তবু, আন্ডারগ্রাউন্ডেই থাকি। যখন কৃষ্ণনগরে ছিলাম, তখনো ছিলাম, এখন যে আসানসোলে থাকি, এখনো আছি। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণনগরের বাড়ি আমার পৈত্রিক বাড়ি। তার বয়স ১৯৯৩-এ ৫৫ বছর হল। অর্থাৎ ঐ বাড়ি দেশভাগের আগে। তার চুনকাম হয়েছে বটে, কিন্তু তার এলিমেন্টাল কোনো পরিবর্তন হয়নি। বস্তুত গুণগত কি পরিমাণগত কোনো পরিবর্তনই হয়নি। যে কারণে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর শোবার ঘর বছর-বছর বদলেছে।

নির্দিষ্ট ঘর রাখা যায়নি। আমার বাবা কৃষ্ণনগরের চাকরির সূত্রে ১৯৩৯-এ এসে, প্রথমে ভাড়া বাড়ি—পরে এই বাড়ি করেন কিন্তু সেভাবে বাড়ি করেননি এই কৃষ্ণনগরে এসে। আমাদের দেশবাড়ি, রংপুর নীলকামারীতে যেমন বেডরুম তথা মাস্টার বেডরুম ছিল না—ছিল উত্তর ঘর, দক্ষিণ ঘর, বড়ঘর, বাইরবোর (বৈঠকখানা) ঘর, ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর আমিষ, রান্নাঘর নিরামিষ (হবিমিষ)—প্রায় তেমনি এই কৃষ্ণনগরেও বাবা যে বাড়ি করেছিলেন, তাতেও শোবার ঘর ছিল না। কেবল বড়ঘর, মাঝের ঘর, গ্যারেজের ওপরের ঘর, ফালতু ঘর (একপ্রকার স্টাডি-কাম-গেস্ট রুম—এখানে বলা ভালো, আমার, ঠাকুরদা এই নীলকামারীর কল্যাণে, দু-চারটি স্টেশন পর, হলদিবাড়ির নেক্সট স্টেশন, তৎকালীন জলপাইগুড়িতে, যেতেন—এ সূত্রে আমার পিশিমার বড় ভাশুরের, যিনি চা বাগানের ম্যানেজার ছিলেন, ডুয়ার্সের দেবপাড়া টি-এস্টেটের, কাছে যেতেন—সেখানেও এই ফালতু ঘর ছিল, যা ছিল আদ্যন্ত গেস্ট রুম) ইত্যাদি ঘর ছিল এই কৃষ্ণনগরে। কিন্তু আমি, বাড়ির বড় ছেলে, আমার বিবাহিত জীবনের শোবার ঘর, আমার একমাত্র ভায়ের ও বোনের শোবার ঘর, ইত্যাদি নির্দিষ্ট ছিল না। আমরা আসানসোল থেকে ছুটি-ছাটায়, কলেজে অধ্যাপনা করার দৌলতে, দু-দুবার বছরে বড় ছুটি পেয়ে যখন যেতাম কৃষ্ণনগর, তখন কোনোবার এই মাঝের ঘর অথবা গ্যারেজের ওপরের ঘর, কখনো-বা এই ফালতু ঘরে থাকতাম, এ নিয়ে আমার স্থায়ী অনুযোগ ছিল। কেননা, নির্দিষ্ট ঘর না থাকলে কনজুগাল-লাইফে কতকগুলি অসুবিধা দেখা যায়, সে নিয়ে জীবনে যে কত টানাপোড়েন এবং সেই সূত্রে আমাদের উভয়ের কত যে আন্ডারগ্রাউন্ড তৈরি হয়, সে সব কথা সময়কালে বলা যাবে। এখানে বলে রাখা ভালো, বড় ঘর বলে কথিত ঘরে মা-বাবা শুনতেন, বরাবর শুনতেন,—এতেও আমার স্থায়ী ক্ষোভ ছিল। সে যাই হোক, এই কৃষ্ণনগরী কাঠামোতে আমার আন্ডারগ্রাউন্ড ছিল এই ফালতু ঘর। ফালতু ঘরে একটা নীলকামারী কায়দার ‘কার’ ছিল। ‘কার’ হল এখনকার loft অর্থাৎ upper room, upper chamber, অর্থাৎ যদিও তা ‘কার’/upper chamber কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই ছিল আমার আন্ডারগ্রাউন্ড, ওখানে উঠবার বিলট-ইন সিঁড়ি ছিল, লোহার। ওখানে রাখতাম এই ডাইরী। তাও এক কাঠের বাক্সে, যেখানে পুরনো বই থাকত, বাবা কিছু ফেলতে পারতেন না।

এ ‘কারে’ আমি জীবনে প্রথম সহবাস করি আমার প্রতিবেশী এক ‘দিদির’ সঙ্গে। আমি তখন ক্লাস টেনে পড়ি, ১৯৫০, এই দিদি তখন স্কুল টিচার, ইংরেজির। অসম্ভব ভালো ইংরেজি জানতেন। ট্রান্সলেশনে মাস্টার ছিলেন। লেটার-রাইটিঙেও। কত চিঠি আমাকে লিখেছেন। আমি তখন কলকাতায় এম. এ. পড়ি। সব বাংলাতে। বাংলাতেও উনি মাস্টার। আমি তাকে আনন্দময়ী^১ ডাকতাম। কেননা তিনি আমাকে, একদা,

১. তুলনীয় : Only good actions are expedient ; only a man who is kind is reasonable and reasonable to the exact extent of his kindness : Chernishevsky on Dostoyevsky.

আমার প্রথম ভ্রম্যনক মন খারাপ করার দিনে, আনন্দ দিয়েছিলেন ; না, ঐ আনন্দ নয় । ঐ আনন্দ তো ঐ ‘কারে’-এ, upper chamber তথা sky বা আকাশে, ইয়া loft তো আকাশও হয়, অথবা sky, air ইত্যাদিও হয়—ভাবা যায়—আমার প্রথম সহবাস air বা sky-তে, loft-এ, ‘কারে’ ? ওখানেই রেখেছি আমার সব, আমার ডাইরী, আমার মদের বোতল (এম. এ. পড়াকালীন যে অভ্যাস আমার হয়েছিল সিগনেটের বড়ডার কুপায়, আঃ, ওখানেই বড়ডার কুপায় তৎকালীন সাউথ পয়েন্টের ক্র্যাফটের টিচার কমল কুমার মজুমদারকে দেখি, আর দেখি তাঁর ‘ঢ্যাঙা’কে, অর্থাৎ মানিকদা সত্যজিৎ রায়কে । ঐ কমলদাই আমাকে ১৯৫৮ তে প্রথম কে. টি., খালসি টোলায় নিয়ে যান, ছোট এলাচ তারপর খাওয়ান, রদ্যপানের পর কুলকুচি করতে হয়, তাতে দাঁত ভালো থাকে এ-সব শেখান) আমার নিজেরই উপার্জন থেকে সরানো টাকা (এরিয়ার বাবদ পাওয়া টাকা, ইউ. জি. সি.-র, যা মা বা শ্রীর গোচরে ছিল না, তাও আমি ঐ ‘কারে’ রাখতাম । এই সোদিনও রেখেছি, ১৯৯০-এ, যখন এরিয়ার বাবদ বেতনবৃদ্ধির ৪৫ হাজার টাকা পাই—তার থেকে ৫০০০ সরিয়ে রেখেছিলাম ঐ কারে, তা দিয়ে কি করোঁছি যদি কারুর কোতুহল থাকে জানার, তাহলে তাকে জানাই, একদা ১৯৭৫ পর্যন্ত নকশাল-বাড়ির দাবানলে ঢেলেছি, পরে আমার গাঙগোলে হিসেবে, যখন ২/৪ শত টাকার হিসেব মেলাতে পারতাম না, তা ঐ আন্ডারগ্রাউন্ড থেকেই ম্যানেজ করতাম । এখন ঐ ‘কারে’ এক কানাকড়ি নেই । কিসে খরচ হল সে কথা পরে । তবে জ্ঞানত কোনো অবৈধ পথে খরচ করিনি । সৌদিক থেকে আমি কৃপণ, কৃপণরা অবৈধ পথে অপব্যয় করতে পারে না, সে-রকম হাড়ি কেম্পন ঐ কারণে আদৌ অবৈধ পথে পা বাড়ায় না । আমি অবশ্য অবৈধ পথে অনেকবার গেছি, সবই প্রায় কানাকড়ি খরচ না করে । যারা বলেন, স্বেচ্ছাচারী হলে, উচ্ছৃঙ্খল হলে সে অপব্যয়ী হয়—কথাটা সত্য হলেও, পুরো সত্য নয়, আমিই তার প্রমাণ, সে কথাও সময়কালে ডিটেলে লেখা যাবে । সবই যে লিখতে হবে আমাকে—কেননা, বিবেকদংশন, না বিবেকদংশন নয়, সত্যের চেহারা যে কত বৈধ ও আবার অবৈধ, এ দেখে আমি আত্মহারা, তথা আমি ডিপ্রেসড, যে জন্য আমাকে লিখতেই হবে ।

লিখে দেখেছি, প্রাণ বড় ঠাণ্ডা হয়ে যায় । তো আমার আন্ডারগ্রাউন্ড হল ঐ । বলা যায়, ১৯৮০ থেকেই, আমার ঐ আনন্দময়ীর সঙ্গে আমার শেষ যোগাযোগ যে ১৯৮০ তে, তখন থেকেই আমি, আন্ডারগ্রাউন্ড বা আন্ডারওয়ার্ল্ড বুদ্ধি, বা কথায় ব্যবহার করি অধিকন্তু ঐ সময়েই এক জঘানে আমার ডস্টয়র্ভস্কির *Notes from the underground* পড়া হয়ে যায় । কান্টের *The Beautiful and Sublime* ও । আমি সব কথা তাকে বলতাম, অর্থাৎ আমার ঐ আনন্দময়ীকে । না, স্বীকার করা ভালো, সব কথা বলা যেত না । বলা যায় না । এই এখন যে সব কথা লিখছি, এ কেবল পারছি, কেন না, এ তো বলা ভালো যে নিজেকেই বলা—তাই পারছি সব লিখতে । তবে এও ঠিক যে কতগুলি কথা আছে, যা নিজেকেও বলা যায় না । বলে,

চাবকাতে ইচ্ছে করে নিজেকে। বলতে ইচ্ছে করে, না, ওসব কথা শিকের তুলে রাখ। ভাবতে নেই সব কথা, কথা—কে হয়, হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!

যাই হোক, আমার ঐ আনন্দময়ী, যাঁর কাছে প্রায় সব কিছুরই কনফেস করছি এবং কনফেসনের সূত্রেই তিনি আনন্দময়ী কেননা ঐ ১৯৫০-এ কৃষ্ণনগরে দেবাদ্বানের মা আনন্দময়ী এসেছিলেন। তখন তাঁর খুবই নাম-ডাক। আমি অর্ধ গিয়েছিলাম ঐ ধর্মসভায়। মা-বাবা তো গিয়েছিলেনই। ঐ আমার আনন্দময়ীও গিয়েছিলেন। সেখানে মহিলারাই বেশি যেতেন। এবং মহিলাদের সঙ্গে, তেমন করে প্রার্থনা জানালে, নিভতে তিনি কথাও বলতেন, শুনতেন। মহিলাদের সবরকম সমস্যার সমাধান করতে পারতেন, যদি তাদের ঐ কনফেসন ঠিকঠাক হত তাঁর কাছে। আমি এমন ‘নিভূত’ (আন্ডারগ্রাউন্ড?) থেকে বেরিয়ে আসা অনেক মহিলার মধ্যে সমাহিত আনন্দ দেখেছি। তাই কনফেস করে আমারও যখন প্রথম আনন্দ হয় আমার আনন্দময়ীর কাছে, তখন তাঁকেও আমি আনন্দময়ী ডাকি। এ কেবল আমার আর তাঁর মধ্যে। সম্ভবত আমার স্ট্রীটের পেয়েছিলেন ১৯৫৮-তে, যে বছর আমাদের বিয়ে হয়, যে বিবাহে আনন্দময়ীর ভূমিকা ছিল মূল্য—এবং সে কথাও যথাসময়ে লিখব।

এখন মাত্র বলার এই, ১৯৮০-তে আমার মা আনন্দময়ী, হ্যাঁ আমার মা আনন্দময়ী, মা, কেননা আমি সেই ১৯৭০-এ বিবাহের বেশ কিছু পরে, আমার মা আনন্দময়ীর বৃদ্ধের দুধ খেয়েছিলাম। তাঁর দু বছর আগে তাঁর বিয়ে হয়। এবং তাঁর বিবাহের একবছর পর তিনি মা হন।... সেই সময় ঐ নকশালবাড়ির কল্যাণে আমি মা আনন্দময়ীর কুচবিহারে যাই। সেও আমার একপ্রকার আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়া। কেননা আমি তখন নকশাল-বাড়ির দাবানলে জ্বলছি। আমার তখন আসানসোলে থাকা নিরাপদ নয়। না, পল্লিশের জন্য না, সি. পি. এম. ঠ্যাঙারে বাহিনীর জন্য। মতাদর্শগত অ্যান্টাগনিষ্টিক কনট্রাডিকশনের হাত থেকে নিজেকে লুকাতে। ওঃ, ভাবা যায়, সেখানে একরায়ে, ভয়ে, আতঙ্কে, কয়েকটি সন্দেহজনক যুবকদের সন্ধ্যায় ঐ আনন্দময়ীর কোয়াটার্সে ঘোরাফেরা করতে দেখে, রায়ে আনন্দময়ীর কাছে শুনাই। একপাশে সদ্য একবছরের শিশু ডানদিকে, আর তাঁর বাম পাশে আমি। বামবিচ্যুতি অথবা আলট্রা-লেফটিজম, অ্যান ইনফেনটাইল ডিজঅর্ডারে একেবারে ভয়াবহ শিশু বনে গিয়ে, আনন্দময়ীর বৃদ্ধকে মূখ গুঁজে। যখন সদ্য শিশুকে দুধ খাইয়ে তার বৃদ্ধ খোলাই ছিল। সেখানে মূখ দিয়ে শিশুর মূখ দেয়া বামবৃদ্ধের দুধ খাই। আনন্দময়ী আমাকে বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলেছিলেন, আয় বৃদ্ধে আয়, খোকন আমার ভয় কি, তাকে বৃদ্ধে আগলে রক্ষা করব।

রক্ষা পেয়েছিলাম। মায়ের বৃদ্ধের দুধ যেমন রক্ষা করে শিশুকে, তেমনি সেদিন আনন্দময়ী আমার ইনফেনটাইল ডিজঅর্ডারকে রক্ষা করেছিলেন।

যে কথা আগে লিখতে চেয়েছিলাম, সেটা লিখে নি’ দ্রুত, কেননা, স্ট্রীর আসার সময় হল, তাড়াতাড়ি লিখে আজ এই আসানসোলার loft-এ রাখতে হবে। বলা বাহুল্য, এখানে এই আসানসোলে, আমাদের ফ্ল্যাটে, যথার্থই loft ছিল।

লিখি যে, ১৯৮০-তে আনন্দময়ীর কলকাতায় ইংলিশ ইনস্টিটিউটে ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং নেবার সময় একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম ঐ মদুস্তাগনের পাশে ইনস্টিটিউট অব ইংলিশে। লাইব্রেরীতে ছিলেন তিনি। কথা-কথাস্তরের পর জানালেন, এই দ্যাখ তোর আন্ডারগ্রাউন্ড, এক টাউস ডিকশনারী খুলে পড়তে দিলেন, দেখলাম লেখা : *below the surface, hidden, secret, not public, avoiding notice, a secret system by which slaves were enabled to escape to the free states and Canada,... below the earth, in a hidden or obscure manner.*

তো ঐ আমার আন্ডারগ্রাউন্ড। অবসাকিওর, রিয়ালি অবসাকিওর। এবং আমার সিক্রেট সিসটেমও। যে সিসটেমে আমি আমার ফ্যামিলি থেকে পালাই, কিন্তু ইতিহাসের মতো ফ্রি-স্টেট কোথাও পাই না।

আনন্দময়ী ১৯৮১ সালে আমার সঙ্গে শেষ যোগাযোগ করেন। যে বছর এক ক্যাম্পে তিনি শিলিগুড়ি যান। ঐ মাধ্যমিকের ইংরেজি নতুন সিলেবাসের তালিম দিতে যে ক্যাম্প শিলিগুড়িতে হয়, তখন আমি মামাবাড়িতে, ঐ ১৯৮১ সালে, মামার ছোটছেলের বিয়েতে। সেখানে দেখা। আনন্দময়ী বলেন, তোর উচিত ঐ আন্ডারগ্রাউন্ডের সঙ্গে আন্ডারওয়ারল্ডের সম্পর্ক খোঁজা। তুই সেই কোর্চাবহারে যখন আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলি তখন যা করেছিলি আমাকে নিয়ে তাকে কি কেবল আন্ডারগ্রাউন্ড বলে? তাকে আন্ডারওয়ারল্ড বলে।

বলতে কি, আমি এই ডাইরীতে অনেকবার ভুলে আন্ডারগ্রাউন্ড লিখতে আন্ডারওয়ারল্ড লিখেছি। ঐ ওয়ারল্ড ও গ্রাউন্ড তো আইডেনটিফ্যাল। কী, তাই না?

আনন্দময়ী বলেন, খেয়াল রাখিস, আন্ডারওয়ারল্ড হল : *The Sublunary or Terrestrial world, the abode of dead, the nether world, a sphere or region beyond the world, lying below the ordinary one.* ঐ Sublunary-র অর্থ?—অর্থ হল *Subject to the moon's influence*, চন্দ্রাহত হওয়া যাকে বলে, আর *terrestrial* শব্দের অর্থ হল *opposite to heaven*.

জানার পর আমার আর একটা কথাই লেখার থাকে—বাবা লোকনাথের কৃপা ছাড়া এ জানা সম্ভব না, এ লেখাও সম্ভব না। কেননা তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেন। এই বাবা লোকনাথও এক আন্ডারগ্রাউন্ড অথবা আন্ডারওয়ারল্ড।

কিন্তু সে কথা পরে। তার আগে লিখি যে, ইনি অর্থাৎ এই বাবা লোকনাথ, আমার মা আনন্দময়ীর বাবা। আমার দুঃখ দুর্দশার দিনে, আমার দুঃসময়ে, যখন আমার সন্ধ্যা আসত মন্দ মন্থরে, যখন আমার সব সংগীত ইংগিতে থেমে যেত, সেই ১৯৭৫ থেকে, জরুরী অবস্থার কালে, প্রথম, মা আনন্দময়ী, আমাকে একটা পকেট ফোটোকর্ড দেন।

যেখানে বাবা লোকনাথ আছেন। গোমুখ আসনে বসে। তলায় সেই বরাভয় : রণে-বনে-জলে-জঙ্গলে যেখানেই বিপদে পাঁড়বে/আমাকে স্মরণ করিও, আমি রক্ষা করিব।

মা আনন্দময়ী বাবা লোকনাথকে পেয়েছিলেন তাঁর স্বামীর কাছ থেকে। তাঁর স্বামীর মাতুলালয় বারোদীর নাগ হওয়ায়, সেই সুদ্রে, বাবা লোকনাথ এসেছেন ঐ স্বামীর কাছে। এবং কথিত যে, ঐ ফোটো, ঐ নাগ মহাশয়ের ব্যবস্থাক্রমে তোলা ফোটোর কপি। সে অনেক-অনেকদিন আগের কথা। মানুষ তখন রণে-বনে-জলে-জঙ্গলে আজকের মতো এতটা বিপদে পড়ত না। তাই, আজকের মতো স্মরণ হত না তাঁর। তাঁর অলৌকিক জীবিত জীবনে তিনি, বস্তুত যত না রক্ষা করেছেন জনমানুষকে, তার চেয়ে এখন, অনেক-অনেক বেশি রক্ষা করতে হয় তাঁকে। কার্যত এত রক্ষাকার্যে এখন তিনি এমত ব্যাপ্ত যে, তাঁর দেহরক্ষার আগে, তিনি বলা যায়, এর কানাকাড়িও রক্ষা করেননি। এখন তাঁকে প্রতিদিন, ১ লক্ষ ছিয়াশি হাজার স্মরণের মধ্যে ৯৩০০০ স্মরণে সাড়া দিতে হয়। অর্থাৎ ১,৮৬,০০০ স্মরণের মধ্যে ৯৩,০০০ স্মরণ, রিয়ালি রক্ষা পায়।

এখন আমিই বা প্রতিদিন ঐ ৯৩০০০ ভাগ্যবানের মধ্যে পড়ব না কেন? এতে যদি প্রমাণ হয় আমি ঈশ্বরবিশ্বাসী তাহলে এও প্রমাণ হয় যে আমি আত্ম-প্রতারক। চৈতন্যের কাছে, অবদমিত কামনার কাছে, স্বপ্নের কাছে, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার কাছে, কল্পনার কাছে, আমি কি আত্মপ্রসারিত নই? আমি কি আত্মপ্রতারক?

চৈতন্যের কাছে, অন্তত স্বপ্নের কাছে প্রতারণা করা যায় না। সিগমুন্ড ফ্রয়েড কবেই এ কথা প্রমাণ করে গেছেন। অতএব লিখি যে, আমি ঈশ্বরবিশ্বাসী নই, আমি বাবা লোকনাথকে স্মরণ করি। অবশ্য ঐ যে রণে, বনে, জলে, জঙ্গলে—এখানে আমাকে ‘রণে’, ঐ ১৯৭৫-এ কয়েকমাস, মানে করতে হয়েছিল শ্রেণীসংগ্রামের তথা রণাঙ্গণের ‘রণ’, আর এখন সব ধুয়ে মুছে, এখন আমি ‘রণ’ বলতে বুদ্ধি সংসার অঙ্গনের সেই দিল্লীকা লাভু, অর্থাৎ স্ট্রাগল, স্ট্রাগল ফর সুপ্রিমিসি, স্ট্রাগল ফর জাস্টিস, বস্তুত যা স্ট্রাগল ফর একজিসটেনস।

লিখি যে, আমি ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও সারদা-মাকেও স্মরণ করি। স্মরণ করি মানুষকে। কিন্তু আদ্যমাকে পারি না, দেবাদিদেব মহাদেবকে পারি না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পারি না—পারি লোকনাথ বাবাকে, ঠাকুর রামকৃষ্ণকে, সারদা-মাকে, স্বামীজীকে, স্বামীজীকে, স্বামীজীকে।

বিবেকানন্দকে বাল্যকালে স্মরণ করতাম খুব। যখন স্বপ্নদোষ হত আমার, তখন বীর্ঘ রক্ষার্থে বিবেকানন্দকে স্মরণ করতাম।

স্মরণ তো মানুষকেই।

কিন্তু ঈশ্বরকে স্মরণ করব কি করে? যখন কবেই জানিয়ে গেছেন অ্যারিস্টটল, He has no eyes, no ears, ইত্যাদি। কোলরিজ সূর্যাস্তের সূর্যকে যতই বলুন like God's own head—ঈশ্বরের মাথা নেই, He has no head অ্যারিস্টটল স্পষ্টতঃ বলে গেছেন।

নিজেও বন্ধি তো, জীবনের উৎস সম্বন্ধে এগিয়ে। চৈতন্যের জগৎ কেবল আমাদের এই স্নেহের সবুজগ্রহের জীবপ্রবাহে। আমাদের সৌরপরিবারে আর কারুর প্রবাহে চৈতন্য নেই বলেই জানি। সবার আগের কথা বড় অন্ধকারে। সেখানে কেবল, চারিদিকে, নীল সাগর দেখি। অচৈতন্যের সমুদ্র। তারও, তারও আগেকার কথা (আসলে অনাদির তো আগের কথা নেই—সে যে অনাদি) বড় আগ্নেয়। সূর্যই যদি আমাদের পেরেন্ট মান হন, অথবা আদি পিতা, তো সেই সূর্যের তো চৈতন্য নেই। যদিও, কেউ তাঁকে না বলতে তিনি এসে যান পাংচুরালি পূবের আকাশে, পূবের হাওয়ায়। এবং এই যে এসে যান, বা এই যে সূর্যোদয়, এ সব কথাও কিন্তু সঠিক নয়। এতই অচেতন এই সূর্য যে, এঁর উদয়-অস্ত বলে কিছু নেই। সূর্য কেবল ঘোরাচ্ছেন আমাদের। না ঘুরিয়ে পারছেন না বলে অবশ্য নিজেও ঘুরছেন। বড়ই আন-কনসাস তাঁর এই ঘূর্ণি। তাঁর হিলিয়াম, তাঁর হাইড্রোজেন, পুনরায় তাঁর হিলিয়াম অচেতন পদার্থ। ওঃ, কী উদ্ভাপ এই অচেতন ক্রিয়া-কর্মের!

হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে। অমাময়ী নিশি যদি সৃজনের শেষ কথা হয়, আর তার প্রতিবিশ্ব যদি হয় মানবহৃদয়—তাহলে অমাময়ী নিশি ও মানবহৃদয় যাত্রাকালে প্রতিবিশ্ব—সমান্তরাল হলেও, দেখেছি ভোরের বেলা জেগে উঠে ঐ অমা ও আমি আইডেনটিক্যাল—অতএব হে ঈশ্বর, তোমাকে যে ভাবেই ভাবি না কেন, তুমি সেই অচেতনই থেকে যাও, তুমি পাষণ, তুমি অগ্নি, তুমি বধির, তুমি অন্ধ, তুমি রূপাতীত, তাই তোমার রূপ নেই, তুমি গুণাতীত, তাই নিগুণ, তুমি অচেতন, তাই নির্বেদ।

তবু তোমার মহিমার অন্ত নেই। কেননা আমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড থেকে যদুগে যদুগে এসেছি চালিয়া, স্থালিয়া, স্থালিয়া; রূপ হতে রূপে। কিন্তু প্রাণ হতে প্রাণে কি? তুমি কি প্রাণ? তবু সে তোমারই দান। গ্রহণ করেছে যত ঋণী তত করেছে আমায়।

‘জরায়ু ত্যাগের পর বিস্তীর্ণ’ আলোকে এসে শিশু সৃষ্টির সদর্থ বোঝে, নিজস্ব পিপাসা, ক্ষুধা পায়। অন্ধকার সীমা ছেড়ে চেয়ে দ্যাখে, আরো পারিসীমা আকাশের নীলে, চাঁদে, নক্ষত্রের আবহানে নিহিত।’

‘মানসেন্দ্রের এক বিশ্ব আছে মানসের বিশ্বও বাস্তব। যত বেশী স্পষ্ট করে মানসেন্দ্রের মাঝে কল্পনাকে দেখি, ঠিক তত স্পষ্ট এক বাস্তব প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি হয়ে থাকে। মানসেন্দ্রের দেখা দৃশ্যই এ বাস্তবের দৃশ্যাবলী হয়, সেই হেতু এ-অদ্বান আমাদের জননের প্রকৃষ্ট সময়।’

সেইজন্যই তো লিখছি, লিখতে পারছি এ অদ্বানে। আরও লিখি যে, ‘পৃথিবী, ঘাস, মাটি, মানুষ, পশু ও পাখী—সবার জীবনী লেখা হলে, আমার একার আর আলাদা জীবনী লেখা না হলেও চলে যেত বেশ।’

‘আমার ব্যথা, প্রস্তাব, প্রয়াস, তবু সবই লিপিবদ্ধ থেকে যেতো। তার মানে মানুষের,

বস্তুদের প্রাণীদের জীবন প্রকৃতপক্ষে পৃথক পৃথক অসংখ্য জীবন নয়, সব একত্রিত হয়ে একটি জীবন মোটে...

যদি সেভাবে ভাবা যায়, তাহলে, এই যে আমি লিখে যাচ্ছি, নিজের কথা, এক বাস্তবিক নিজের কথা? যে কথাগুলো উল্লেখ এই কথা, সেই কথাগুলো কিন্তু নিজের কথা নয়, সবই বিনয় মজুমদারের কথা। এবং এ বড় আশ্চর্য যে, কথাগুলো আমার নিজেরই। বল্লে বিশ্বাস যাবেন না, বিনয় মজুমদারের সিনট্যাক্স, আমারো সিনট্যাক্স। তেমন জীবনানন্দও, অর্থাৎ জীবনানন্দের, না সিনট্যাক্স নয়, জীবনানন্দের স্ট্রিম অব কনসাসনেন্স, আমারো স্ট্রিম অব কনসাসনেন্স। চেতনার ভাষা এক।

এই বেলা এই কথা সেরে রাখা ভালো যে, পরিচিত বন্ধু-বান্ধব প্রায়শই আমাকে বলেন, তুমি বিনয় মজুমদারের মতো কথা বল, বেশি বোলো না, পাগল হয়ে যাবে। সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি জয়, ওগো জয় গোস্বামী, বিনয় মজুমদার পাগল? তুমি তো জানো ভালো, বিনয় বেড়ে শূন্যে আছে, জানিনা সে ঐখানে শূন্যে আছে কিনা! বিনয় চলে গেল অতদূর? সিঁড়ি ছাড়া? পাখিদের মতো পাখা বিনা?

জয়, জয় গোস্বামী, তুমি যদি এ লেখার পাঠক হও কখনো তাহলে নিশ্চয় তোমার খেয়াল হবে তুমি যেমন আমাকে চেনো না আমিও তেমনি তোমাকে চিনি না— তোমাকে পড়েছি মাত্র উন্মাদের পাঠক্রেম। দিনপঞ্জী লিখছি বটে কিন্তু জীবনানন্দ বিনয় জয় কারুর সাথেই আমার কোনো পরিচয় নেই। এই দিনপঞ্জী একবার শূন্য হয়েছিল ১৯৫১-তে, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে। কেটে গেল কলেজে ভর্তি হয়ে। আরেকবার শূন্য হল গাড়ি বেদনায়। ১৯৫৮-তে। যখন আমার স্ত্রীর লাইফ-স্টাইল আর আমার লাইফ-স্টাইলে বিনিবনা হল না। আবার কেটে গেল ১৯৬২-তে। যখন চীন-ভারত কলহ শূন্য হল। ওঃ, বিশ্বাস করো জয়, ঐ চুলোচুলি আমাদেরও হয়েছে স্বামী-স্ত্রীতে। ঠিক ঐরকম। একেবারে ঐরকম। কানে বাজে কেবল ঐ হিন্দী-চীনী ভাই ভাই অথবা 'যদিদং হৃদয়ং তব...' ইত্যাদি; আর তৎকালে ঐ চীন-ভারত কলহে শক্তি-সুনীলদের কি অমানুষিক কলহপ্রিয় ক্রোধ: দু-একটা মনে আছে আজো— 'আমরা এমন হিংস্রভাবে তোমাদের মদুখোমুখি দাঁড়াবো/যেরকম ভাবে মানুষ কখনো পৃথিবীতে দাঁড়ায়নি / কেননা পৃথিবীর এই অতুজ্জ্বল সময়ে / তোমরা জানোয়ারের মত / মানুষের আত্মা ও অস্তিত্বের উপর গোলাবারুদ রেখে যুদ্ধ করছ।' ...জানো জয়, ঠিক আমার মার মতো, ঐ ১৯৬২-তে উনিও, আমাদের প্রথম দাম্পত্য-কলহে ঐরকম কুস্তীরাত্র ছেড়েছিলেন, আসলে খুঁশি হয়েছিলেন আমার মা, খুঁশি হয়েছিলেন আমাদের দাম্পত্য-কলহে। যেমন খুঁশি হয়েছিল ওরা। ওরা যারা চীন-ভারত মৈত্রীকে ভালো চোখে দেখেনি। ভাবলে বুক ফাঁকা হয়ে যায়, শক্তি-সুনীল অপেক্ষা করল না, 'বরণ অপেক্ষা কর যখন যন্ত্রণা', রাম বসুর কাছে একথা শুনেনও অপেক্ষা করল না, ঘটনা ঘটবার আগেই লিখে ফেলল, 'আমরা সাপের মতো নোংরা ও আশ্বাসপ্রদান তোমাদের কাঁধে হাত রেখে/দেখব না তুমি'।

আহারে, চীন, জয়, শোনো, কি লিখেছিলেন তোমার অগ্রজ—লিখেছিলেন, ‘তোমাদের প্রতি তোমাদের নারীদেরও ভালোবাসা নেই / কামনা করব / আমরা ভালোবাসতে পারবো না তোমাদের দেশের / কচি কচি ছেলেমেয়েদের মুখ।’

ভাবা যায় জয়, তুমি কাদের ভাই, ভাবা যায়? এত কথা লেখার দরকার ছিলনা। যদি না ঐ ও’দের তুল্য কথা আমার মাও সে সময় না বলতেন। ‘তোর ঐ সন্তান যখন আসে আসুক, তাকে কোলে নিতে পারব না।’

ঐ ১৯৬২-তে আমার স্ত্রী মায়ের ব্যথা পেয়েছিল কিন্তু ছেলে পায়নি কোলে। অ্যাবোরশন হয়ে গেল পাঁচমাসের আগেই। মায়ের আর পঞ্চামৃত দেয়া হল না। ক্রমক্রমদে আমি যখন দ্বুগ্ধসহ টানে কণ্ঠ পাচ্ছি, তখন মা আমার, আমার বৃদ্ধকে-পিঠে পান-তেল মালিশ করতে করতে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, ‘সন্তান গেলে, সন্তান আসে।’ কথাটা ছিল, বৌ মরলে বৌ হয়। কিং ইজ ডেড, লং লিভ দা কিং। অর্থাৎ আমরা ভালবাসতে পারব না তোমাদের দেশের কচি কচি ছেলেমেয়েদের মুখ। এবং তোমাদের প্রতি তোমাদের নারীদেরও ভালোবাসা নেই কামনা করব।

জয়, যে কারণে তোমাকে স্মরণ, সে কথা লিখি। লিখি যে, তুমি লিখেছিলে, ১৯৮৪-৮৫’র কোনো এক সময়ে, যখন আমার স্ত্রীর ভিতর থেকে ইউটেরাস খুলে নেয়া হল। সেই রক্তাক্ত তথা পোরুষ দিনে, লিখলে তুমি, শিক্ষা নাও, শিক্ষা এই উন্মাদের পাঠক্রম/খুলে দিলাম আজ থেকে / ছাত্রদের সংখ্যা কম / খাদ্যহীন মাংসভুক সূক্ষ্ম কাজ কামড়ে খাও। / এই দিলাম অন্ধকার চিংকারের মাংসহাড় / উন্মাদের মাংসহাড় খাচ্ছি খাই লাগছে বেশ / নাকের জল চোখের জল, মাতৃবৃক ভগ্নীবৃক / খাচ্ছি খাই লাগছে বেশ জ্বলছে ভোগ ভোগজ্বালা / রোগ নিভুক।

হ্যাঁ রোগ নিভুক।

এই যে জয়, তোমার সঙ্গে কথা—এতো তুমি ভালই জানো, তোমার সঙ্গে বাস্তবিক কোনো কথা হয়নি—বিনয়ের সঙ্গেও কদাচ না—আর জীবনানন্দ, তিনি ছিলেন দূর অন্ত—এ দাস রহুঁ দূর। তবু ভাব-ভাবনা এমন, যেন সব ভাই-ভাই, সহোদর। হ্যাঁ, সহোদর। সবাইকে জানাই ইত্যবসরে, চিৎপ্রবাহের ল্যাংগুয়েজ সবারই এক—তা সে কাফকাই হোক, অথবা ডস্টয়ভস্কি, কিংবা জীবনানন্দ-বিনয়-জয় অথবা আমি। এই আমি এবং সবাইকে জানাই আরো, দিনপঞ্জী মানুষের মনের নিকটতম লেখা।

বলা বাহুল্য, বাক্যাট বিনয় মজুমদারের। তবু লিখি যে, দিনপঞ্জী, ডাইরী, মানুষের মনের নিকটতম লেখা। এবং বাক্যাট আমার। একান্ত আমারই।

ঐ মনের নিকটতম কথা লিখতে গিয়ে, মনে আছে ভালো, আমি সেই ‘কার’, ‘loft’, upper chamber তথা underground-এ, আমি, প্রথম সহবাস করেছিলাম, লিখেছিলাম।

কথাটা লিখতে তখন আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে আসছিল। তবু লিখেছি। এখন ভাবতে বৃক ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে আমার কেননা, ঐ সহবাসের কথা দিয়েই প্র্যাকটিক্যালি আমার লেখা শূন্য।

গভীর ভাবে ভাবলে বদ্ব্যতে পারি, যেহেতু এই লেখা মনের নিকটতম লেখা, তাই ঐ বাক্যই আসে আদিতে। এখন তো জেনেই গেছি, প্রকৃতির ভিতরকার কথা হল ঐ সহবাস। যে জন্য ঐ কুসুমে, ফুলে বর্ণ, সুগন্ধ, এবং প্রজাপতির আকর্ষণ। তার মানে ফুলে ফুলে চলে চলে বহে যায় বাবু প্রজাপতি। স্পষ্ট যেন শূন্য কোনো বাবু প্রজাপতি অন্য কোনো বাবু প্রজাপতিকে বলছেন, পাড়ায় (ফুলপাড়ায়) গিয়ে দেখে এলেম একটি ডাগর কালো মেয়ে (কালো গোলাপ)। এই চলছে ফুল বাগানে। প্রকৃতির রেড লাইট এরিয়া। এইমাত্র মনে পড়ে গেল কালো গোলাপের কথা। সেই আমার মতো আউটসাইডার কামু যেমন দেখেছেন, মাকে কবর দিয়ে এক ছুটে চলে এসেছি বাম্ববীর কাছে, সহস্রান হল খুব, বেলাভূমিতে ভ্রমণ যথেষ্ট হল, এক আরবকে গুলি করে মারলাম কারণ জানিনা, পরক্ষণই পূর্বদৃশ্যের সেই অন্ধকার ঘর, রাশি রাশি কালো গোলাপ। আমি যে আউটসাইডার, আমি যে এখন আন্ডারগ্রাউন্ডে, প্রকৃতি আমার চারপাশে রাশি রাশি কালো গোলাপ ফোটালােন, যেন শক্তির সেই 'সারঙ্গ, যদি বর্ণা ফোটাই', তেমন কালো গোলাপ ফোটালাম।

আমার আন্ডারগ্রাউন্ডে বস্তুত রাশি রাশি কালো গোলাপই থাকে, বিশ্বাস করুন, অন্ধকার থাকে না।

তাই সহবাস যে প্রকৃতিরই মনের কথা, টের পেয়ে আমি যে সারাদিন সারারাত, কারণে অকারণে, যখন-তখন, যত্নতর, ঐ সহবাসের কথা ভাবি—এ আমার প্রাকৃতিক কর্ম, আমার প্রাত্যহিকী। প্রকৃতি আমাকে প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড দিয়ে, তদুপরি পুর্নালগ্ন করে, আমাকে কেবল সহবাসের কথা ভাবাচ্ছেন। কার্যত এটা আমার ডেস্টিনী। এতেই বস্তুত আমার কপাল পোড়ে।

লিখি যে, সহবাসে যে প্রবৃত্তির কাঁধে হাত রাখা আছে, তা কিন্তু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক না। প্রকৃতি, ঐ প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেন, কিন্তু যেইমাত্র তিনি প্রবহমান হলেন অর্থাৎ শিশু ঘরে এলো, ঘর আলো করে শিশু ঘরে এলো—অর্থাৎ প্রকৃতি সহবাস থেকে প্রবৃত্তি কেড়ে নিতে পা বাড়ান। প্রবৃত্তি পুরো, কেউ কাড়তে পারে না। ওটা স্বভাবের অন্তর্গত। তবু প্রকৃতি মধ্যবর্তে শিশু রেখে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান। মানুষজনের ভিতর, পশুপাখির প্রজাতিদের ভিতর যে যেমন পারে প্রবৃত্তিকে সহবাসের উপর মাতব্বীর করতে দেয় না। কেননা শিশুর কান্না আছে, হাসি আছে, অস্তিত্ব আছে, সে সমাজকে তার চারপাশে জড় করছে—এসবে প্রবৃত্তি কিছুর বিনয়ী হয়, আত্মনিয়ন্ত্রিত হয়, সামাজিক হয়। প্রবৃত্তি সামাজিক হলেই তা বৈশিষ্ট্যক। সূক্ষ্মানুদানী। বায়োলজিকাল।

Mind is never without thought....সব চিন্তা পারি কে লিখতে?

লিখি, বাবা লোকনাথের জীবনী পাড়িয়েছিলেন ঐ মা আনন্দময়ী। তাতে লেখা, আজন্ম ব্রহ্মচারী লোকনাথ ফিরে এলেন জন্মভূমি দর্শন করতে। এখানে জগজ্জননী মহামায়া এক মায়াজাল বিস্তার করলেন লোকনাথের জ্ঞানের দীপশিখাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে। তিনি এক চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। গুরু ভগবান গাঙ্গুলী।

লোকনাথ ও বেনীমাধব অনেকদিন পর গ্রামে ফিরে আসায় এক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় গ্রামে। গ্রামবাসীরা সাধ্যমতো সন্ন্যাসীদের সেবা-যত্নের জন্য এগিয়ে আসেন।

এদের মধ্যে লোকনাথের বাল্যকালের সাথী ছিলেন এক বাল্যবিধবা। তিনিও এলেন নিষ্পাপ মনে সাধু সেবার জন্য। গুরুদেবের আদেশে এই মহিলা লোকনাথের সেবার ভার নিলেন। আন্তরিক সেবা-যত্নের মাধ্যমে এই সেবিকাটি লোকনাথের হৃদয়ে নিজের আসন স্থাপন করে নেন। মহামায়ার মায়ায় উভয়ে উভয়ের আকর্ষণে বাঁধা পড়েন।

কিসের যেন একটা দুর্নিবার আকর্ষণে চঞ্চলচিত্ত হয়ে পড়েন তাপস লোকনাথ। ধ্যান সমাধিতে মনঃসংযোগ করতে পারেন না। নিজেকে সমর্পণ করেন মেয়েটার বাহুবন্ধনে। অনাস্বাদিত হিন্দ্রিয় সুখের আনন্দে যেন হাল ভাঙা, পাল ছেঁড়া তরীর মতোই তিনি ভেসে যান। যেন তরী সেই সাগরে ভাসান, বাহার ক'ল তিনি নাহি জানেন। গুরুদেব সবই দেখেন, সবই বোঝেন, কিছুই বলেন না। তাঁর অবস্থা দেখলে মনে হয়, যেন তিনি মৌন স্মৃতি জানাচ্ছেন। লোকনাথ ধ্যানাসনে বসে চঞ্চল হয়ে উঠলে গুরুদেব বলতেন— বৃথা সময় নষ্ট করে কেন মনকে কষ্ট দিচ্ছ লোকনাথ। মন যা চায়, তাই কর। জানবে এটাও সেই মহামায়ার লীলা। তোমার জীবনটাই যে যোগময়। ‘কোন কিছুই বাদ দিতে পার না—পারবে না। সকলের মধ্য দিয়েই তুমি লক্ষ্যস্থানে পৌঁছাবে।’

বাবা লোকনাথ লক্ষ্যস্থানে পৌঁছেছিলেন। গোমুখো আসনে বসে, তিনিই একমাত্র সাধক, গোমুখো আসনে বসে হিন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছিলেন। তাঁর ভাবশিষ্যরা তাঁর কার্বনকর্প হতে পারেনি। হায় রে লোকনাথ মিশন! হায়রে লোকনাথ সংঘ!

আমার মা আনন্দময়ীকে ঐ লোকনাথ বাবার জীবনী পড়ে বলেছিলেন, আদ্যন্ত বার্নার্ড শ' তোমার বাবা। শ'ও বলতেন, Never resist temptation, hold first that which is good.

তো, আমিও বলেছিলাম আমার মা আনন্দময়ীকে ঐ ‘কারে’, ‘loft’ এ, আমার underground এ, কার্ভত upper chamber এ, ‘আমি যে পারছি না আর। শরীরের ঘ্রাণ-সুবাস, স্বাস্থ্য-সুস্থতা তো ঐ জামাকাপড়ের তলায়, গাঠহারদ্রায়।...’

তখন ১৯৫০, কেবল ক্লাস টেনে পড়ি, উনি তখন টিচার। আমার তখন ১৪, ওনার ২৪। ওঁর চোখদুটো আশ্চর্য কালো গোরুর মত। শান্ত, বিষম। রোগাই ছিলেন তখন। বয়স দেখাতো আরও বেশি। চুল ছিল খুব। পরন্তু গালে টোল পড়ত।

কারে উঠছি, বাড়িতে কেউ নেই প্রায়, পিশিমাঝা রান্নাঘরে, স্নানান্তে ঢুকছেন, রান্না শেষ করে, ওখানেই, ঐ নিরামিষ রান্নাঘরের মেঝেতে, বসে, খাবেন। ঠাকুমাও আছেন, তিনি কেবল তরকারী কোটেন। তারপর কমিউনিটি লাগু।

আমি একা ঘরে, উঠছি কারে। মাঝামাঝি উঠেছি এমন সময় উনি,—সেকিরে, কোথায় উঠছি, পড়ে যাবি তো? কি আছে, ওখানে? তখন তো উনি আমার আনন্দময়ী না, তখনো উনি আনন্দ দেননি। তাছাড়া তখনো তাঁর কাছে কনফেস করিনি আমার বেদনার কথা। তখন কি করে বলা যায়, আমি ‘কারে’ উঠছি, আমার আন্ডারগ্রাউন্ডে

রাখা একটি ম্যাগাজিন দেখতে, গ্ল্যামার ফোটোগ্রাফের ম্যাগাজিন। ব্দুগাদা দিয়েছিলেন। এই ব্দুগাদার কথা কোনো একসময় লিখব। কেননা ব্দুগাদা আমাকে আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে সাহায্য করেছিলেন খুব। ব্দুগাদার নিজেরও আন্ডারগ্রাউন্ড ছিল। কিন্তু সে কথা পরে। মোটকথা হল, ঐ গ্ল্যামার ফোটোগ্রাফিতে অনেক আশ্চর্য নুড ছবি আছে। আঃ, কি করে লিখি যে, আমার ক্লিনিক রোগ, এপিলেপ্সির অ্যাটাকে যখন আমি মদুহ্যমান হই, তখন, তারপর কনভালসন কেটে গেলে ঐ নুড ছবি দেখলে আমার যেন স্বাস্থ্য ফিরে আসে। কেন তা, কি করে বলব! কেবল এ'কথা লিখতে কেমন, কষ্ট হয় আমার। খুব কষ্ট হয়। একথা লিখতে বড় কষ্ট হয়। এইসব লিখে, আমি কি আলাদা? কেবল আমারই কি এমন লেখা হয়? আমারই কি মদুদ্রাদোষে আমি এমন হতেছি আলাদা? এ ভেবে, এ-সব লিখতে বড় কষ্ট আমার। তবু, সেই কথা বারবার লিখি। লিখি যে, দিনপঞ্জী মানুষের মনের নিকটতম লেখা। এছাড়া আমি মনের নিকটতম কথা কোথায় আর লিখব? আমার জীবনের সব গোপনতা, কেউ না কেউ টের পেয়েছেন, ধরা পড়ে গেছি কতবার, কত কারুর কাছে। কেবল আজ পর্যন্ত এই দিন-পঞ্জীর খবর কেউ জানে না। ধরা পড়িনি এখানে। এখানেও কি বাবা লোকনাথের কৃপা?

মা আনন্দময়ী জানিয়েছেন, বাবা লোকনাথের কৃপা তুই পাবি। তবু ঐ মা আনন্দ-ময়ীকেও বলতে পারিনি, এই দিনপঞ্জীর কথা।

তো সেদিন হল কী, ঐ যে 'কারে' উঠছি সিঁড়ি বেয়ে; মাঝামাঝি পেঁপেছোঁচি কি পেঁপেছাই-নি এমন সময় উনি। কি আছে রে, ওখানে?

—সেকিরে, কোথায় উঠছি, পড়ে যাবি তো। কি ব্যাপার রে, —তোর? ওখানে কি?

—কিছু না। এমনি।

—এমনি উঠছি?

—হ্যাঁ, এমনি। ওখানে উঠে চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগে আমার।

—তাহলে আমিও উঠব।

—না, তুমি না।

—কেন? কেন না?

—না, ওখানে আমি একাই থাকব। থাকি তাই।

—কি তোর গোপন আছে এখানে?

—কিছু না।

—বেশ তো, কিছু না-ই দেখব আমি।

উনি সিঁড়িতে পা দিলেন।

—উঠছ যখন আগেই বলি, এই কথা আর কাউকে বলতে পারবে না। কেউ যেন জানতে না পারে আর।

—বেশ তো, আমার আসা কেউ টের পায়নি। সব গেল কোথায়?

—মা-বাবা বাজারে গেছেন পুজোর কেনাকাটা করতে। আর ঠাকুমা-পিশিমা হেঁসেলে।

—তবে আর কি, তবে তো সোনায় সোহাগা।

বলতে বলতে উনি উঠতে লাগলেন। আমিও উঠে ‘কারে’ যাই। গুঁকে ধরতে হবে, নাহলে কারে পা দেয়া মুশ্কিল। আমি কারে অবস্থান নিয়ে হাত বাড়িয়ে বসে, আর উনি উঠছেন। গুঁর শ্লাউজের ভিতর থেকে নিটোল স্বাস্থ্যবান বুক দেখা যাচ্ছে। ঐ এক আমার এক ডেস্টিনি যে—বুক দেখতে পেয়ে চোখ ফেরাতে পারি না। কেবল মার বুক দেখতে পারি না। চোখ সরিয়ে নিতে হয়। মা আমাকে দুধ ছাড়াতে, এক বছরও হয়নি আমার, বাবার নির্দেশে কুইনাইন মের্খোছিলেন তাঁর দুধের বাঁটে। সেরিক ভুলবার! আমি মরে যাব, তবু ভুলব না ঐ কুইনাইন।

হাত ধরলাম গুঁর। প্রায় টেনে তুলতে হল। টালমাটাল হলাম। কারের উপর আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। পড়ে গেলাম কারে, আর ঝোঁকের মাথায় উনিও পড়ে গেলেন আমার উপরে। সহজে উনি উঠতে পারলেন না। হাঁফাতে লাগলেন। কতক্ষণ কে জানে! একসময় বুদ্ধি, আমার বুদ্ধির উপর গুঁর বুক ওঠা-নামা করছে। কী আশ্চর্য মখমল স্পর্শ! যেন দুধে আদ্র। একবার এ পৃথিবী পায় তারে, পায় নাকো আর। উনি কাত হয়ে নিজেকে সামলালেন। তবু শূন্যে, উঠতে পারলেন না। শাড়ি উঠে গেছে হাঁটু ছাড়িয়ে। হাতের দাঁতের মতো মসৃণ সাদা দুটি পা। ঐ শরীরে এতদিন ছিল ঐ পা, আমি বুদ্ধিতেই পারিনি, যদিও দেখেছি কতবার গুঁর কাঁধ, বুক, পায়ের পাতা, হাতের কনুই, গলা, গলার নিচে, কখনো-সখনো, শ্লাউজের কাটে, গুঁর বুদ্ধির উপরিভাগ—বুদ্ধির নিটোল স্বাস্থ্যবান খাঁজ। কতবার স্পর্শ করতে ইচ্ছে হয়েছে। পারিনি। কতবার এপিলেপ্সির অ্যাটাকের পর গার্ডিনাল ট্যাবলেট খেয়ে কালঘুম ঘুদুমিয়ে, কতবার গুঁকে দেখতে পেয়েছি, গুঁর ঐ বুদ্ধির উপরিভাগ, কতবার; কতবার আমার আরোগ্যস্নান হয়েছে। ঐ সময় বিস্মৃতি ঘটত আমার। কিছুর মনে রাখতে পারতাম না, তার আগে, যা করছি। এমনকি পেটভরে ভাত খাওয়া অশ্বি মনে থাকত না। কতবার ঐ অ্যাটাকের পর, সামান্য ঘুদুমিয়ে, উঠে, মার কাছে ভাত চেয়েছি। মা কেঁদেছে। —এই তো ভাত খেঁলি বাপু, এই তো পেটভরে খেঁলি, হায়, আমার ছেলের এঁকি হল?

মরাকান্না জুড়েছেন, আমি তখন ভেবে পাইনি, কেন এই কান্না। খাইনি ভাত, তবু কেন বলছেন, খেয়েছি নাকি পেট ভরে। কৈ, মনে পড়ে না তো! মনে পড়লে, আমারও বুক ফাঁকা হয়ে যেত। খুব তাড়াতাড়ি মনে পড়ত, যদি গুঁকে দেখতাম। কেমন আরোগ্যলাভ হত নিমেষে।

তের্মিন।

তের্মিন আরোগ্যলাভ হয়েছিল, সেদিন, ঐ ‘কারে’ উনি উঠে বসে কথা বলতেই আমি গুঁর ঠোঁটে আঙুল রেখে ইংগিত করলাম, চুপ।

তো চুপ।

উনি চুপচাপ দেখতে লাগলেন কার। কাঠের বাস্ক ছিল সামনেই। দেখলেন। দেখতে দেখতে এগিয়ে গিয়ে কাঠের বাস্ক ঘাঁটতে লাগলেন।

যা ভয় পেয়েছিলাম, তাই হল, ঐ নুড ম্যাগাজিন দেখে ফেল্লেন।

ফিসফিস করে বল্লেন, ও এই ব্যাপার।

আমি গুঁর হাত চেপে ধরে ম্যাগাজিন কেড়ে নি'। উনি ছাড়েন না। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে, কেন এ-সব ছাইপাশ দেখিস, এই বল্লেন, গাল টিপলে দুধ বেরোয়, তোর এখন থেকেই অসভ্যতা। ফের যদি এ-সব দেখিস তো বলে দেব তোর মাকে।

—না, লক্ষ্মীটি, বোলো না। বিশ্বাস করো, এ-সব দেখলে আমার শরীর ঠিক হয়ে যায়। —সেকিরে!

তখনো ঐ কানে কানে ফিসফিস করে ঐ বিস্ময়, সেকিরে!

তারপর নিজে পাতার পর পাতা নুড দেখতে থাকেন। যেন নিজেরও শরীরে স্নুসুতার ঢেউ দিচ্ছে, এভাবে, নাকের ডগা ঘামিলে, কপাল ঘামিলে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিয়ে, স্লো বাট স্টেডি হয়ে, বিলম্বিত ক্ষিপ্ৰতায় দেখতেই থাকেন। তখন তাঁর শাড়ী পা দেখাচ্ছে, সেখানে মসৃণতায় যেন স্নেহ এবং স্নেহ অতি বিষম বস্তু—উনি ম্যাগাজিন রেখে, আমার কাছে সরে এসে, ততোধিক কানে কানে বল্লেন, সেই অমোঘ কথা, Am I not superior to these paper nudes. তখনো কাগদুজে বাঘ কথাটা শিখিনি।

আমি গুঁকে জড়িয়ে না ধরে পারি না।

—আয়, আয়, তাই যদি হয়, আয় তাহলে, আমার বুকো আয়। বাকি কেবল থাকে সেই একসট্যাসি যার কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই যদিও—তবুও লজিক্যাল ডেভেলপমেন্টে আমরা ঐ 'কারে' শব্দে পড়ি গুঁরই দৌলতে। পরস্পরের উপর শব্দে পড়ি যাদুবলে।

আমার প্রথম সহবাসে আমি ডুবতে ডুবতে অতলে তলিয়ে যাই। ঐ প্রাণান্ধকারে, তখন চারিদিকে, কী আশ্চর্য নীল সাগরের ডাক শুনিনি, অন্ধকারে নীল সাগর ডাকে, নীল সাগর ডাকে অন্ধকারে, শুনিনি। মাথার ভিতর নীলাভ আলো আমার সব সাধ-আহ্লাদকে ডেকে নিয়ে আসে, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারি না। আমি মোমের মত অকালে গলে ঝরে পড়ি।

ঐ আমার কাল। আমার অকালবর্ষণ। তবু আনন্দ। এ আনন্দ যমজ আনন্দ। এখন আরেকরকম আনন্দের কথা লিখি। এতো সেই আনন্দ নয়। উনি আরও কত আনন্দ দিয়েছেন। আমাকে আমার বেদনায় এক আশ্চর্য আনন্দ দিয়েছিলেন তারপর। তারপর থেকে, ঐ সহবাসের পর থেকে উনি আমার ক্রমনৈকটো এলেন দিনের পর দিন। সে কথা ভুলবার নয়। —এপিলেপ্সিতে বাঁধাকপি'র রস খেতে হয়, ভিটামিন 'কে' (K), ঐ রসে, তোর মাথার স্নায়ুকোষের 'মাথাগরম' ঠান্ডা করে দেবে। আমি জেনোঁছি। নে খা, রোজ এমন খাবি, আমি এনে দেব।

আঃ, কতদিন উনি এমন বাঁধাকপি'র রস খাইয়েছেন আমাকে। বছর দুয়েক তো হবেই,

১৯৫৩ সালে কলকাতায় অনার্স পড়তে যাওয়া পর্যন্ত খাইয়েছেন। আমি ভালো হয়ে যাচ্ছিলাম। কেন যে ভাল হয়ে যাচ্ছিলাম, মোটেই ভাল লাগত না আমার। আমার ঐ ক্লিনিক এপিলেপ্সি চলে যাবার মতো হলে, আমার অস্তিত্বই বিপন্ন হতে লাগল। কেউ আমাকে ছাড়ল না, সবাই আমাকে তখন পেয়ে বসল। কেননা আমি আর 'সিক' নই, আমি ফিট। ফিট হয়ে গেলে কে ছাড়ে মানুষকে ?

কেউ না, আমার মাও আমাকে ছাড়লেন না।

এই মা নিয়েই আমার বেদনা।

মারও বেদনা কম ছিল না। বিয়ে হয়ে আসাতক মা আমার ঐ দুই পিশিমার খুপ্পরে। ঠাকুমা ছিলেন অপূর্ব উদাসীন। তাঁর নামও ছিল অপূর্বসুন্দরী। দুধে-আলতায় গায়ের রঙ। আমি দ্বিতীয় দেখিনি আজও।

এক পিশিমা বালবিধবা। ১১তে বিয়ে, ১২তে বিধবা। স্বামী মারা যাবার পর তার পিরিয়ড শুরুর হয়। প্রথম পিরিয়ড থেকেই উনি কোন্ড। কিন্তু রাগে অশ্লীল। মা-বাবার অভ্যাস ছিল দেরি করে ওঠার। পিশিমা সহ্য করতে পারতেন না মার ঐ দেরি করে ওঠা। —এক জ্যোৎস্না (চন্দ্র) চলে গিয়ে আরেক জ্যোৎস্না (সৌররোদ) আসার আগেই যদি ঘুম থেকে না উঠতাম, তখন ঐ ১১/১২ বয়সে, শাশুড়ি একদিন সাঁড়াশি দিয়ে জিভ টেনে ব্যথা দিয়েছিলেন। আমি তো তবু সাঁড়াশি হাতে করিনি।

তাতেই যথেষ্ট। সাঁড়াশি অভিযান তাতেই সার্থক। বিনা সাঁড়াশিতে।

ঐ মা, ছোটবেলায়, ঐ পিশিমার কাছে আমার শোবার দৌলতে, আমাকে মোটে দেখতে পারতেন না। পিশিমা একদিন রহস্যভেদ করে আমাকে কানে-কানে জানিয়েছিলেন, ও তো তোর সৎমা।

শুনে, বেদনায় হায়, ভরে গিয়েছে পেয়লা।

যদি, দুঃখের ভিমে যদি জ্বলে তব মঙ্গলালোক, তবে তাই হোক।

আমি মাথা ঠুকে কত হিসেব করেছি, বলবার নয় আমার জন্ম তারিখ বাবার খাতায় লেখা, স্বচক্ষে দেখেছি, ১৯৩৫, ২৭ ফেব্রুয়ারী। আর পিশিমা বলেছেন, এই মা-বাবার বিয়ে হয়, ১৯৩৬, ৩০ ডিসেম্বর।

—৩০ ডিসেম্বর মানে জানিস ? পৌষ মাসের মাঝামাঝি। ও সময় হিন্দুদের অন্তত বিয়ে হয় না। ও তোর পিশিমার তোর কানে বিষ ঢালা।

—কিন্তু, মা কেন, আমাকে, দুধ দিলেন না আর ? কুইনাইন মেখে দুধ ছাড়ালেন কেন ঐ ১০ মাস দশ দিনের বয়সে। এক বছরও হয়নি আমার তখন।

—আরে তখন যে তোর ভাই এসেছিল তোর মার পেটে !

—তাই বলে কুইনাইন ?

—আর অলটারনেটিভ কি আছে ?

অল্টারনেটিভ, বিকল্প, কথাটা ঐ প্রথম শব্দনি এবং তখন থেকে ঐ বিকল্পের বেনোজলে ভেসে যাই।

—তোর ঐ দুধ খাবার এত সখ? আগে বলিসনি কেন? রোজ তোকে দুধ খাওয়াবো আমি—তাহলে হবে তো?

—ঐ গোরুর দুধ? না, আমি গোরুর দুধ খাব না, ও তো একই হল, বাছুরের দুধ থেকে বাঁট টেনে—দুধ দোয়া হল—না, ও দুধ খাব না।

—তবে কি আমার দুধ খাবি? আমার যদি দুধ থাকত, ঠিক খাওয়াতাম তোকে?

—তোমার বুক আছে অমন সুন্দর, আর দুধ নেই বলছ?

—আরে, দুধ আসে নাকি ছেলেপুলে না হলে?

—বেশ তো, আমাকে তুমি ছেলে কর, মা হও তুমি।

—পাগল ছেলে!

বড় আদরে বুকে নিয়ে, নে খা, পারিস তো, টেনে নে।

স্তন তার, করুণ শব্দের মত, দুধে আর্দ্র, এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর। আমি অন্তত পাইনি। কিন্তু আনন্দ পেয়েছিলাম। আনন্দ হয়েছিল খুব। তবু প্রত্যয় যায়নি। আজও যায়নি। কেননা, আমার জননী, গর্ভধারিণী বার-বার প্রমাণ করেছেন তিনি সৎমা। আর আমার মা আনন্দময়ী বার-বার প্রমাণ করেছেন তিনি মা।

একদিন, যে নীল অন্ধকারে, ‘কারে’ও আনন্দ হয়েছিল খুব, সেই নীল অন্ধকারে, চারিদিকে, নীল সাগরের হয়ে ডাকে, আমাকে ঐ নীল অন্ধকার, এও শব্দনি ॥

মাকে দেখেছি অরব নীল অন্ধকারে, নীল নির্জন দুপূরে, বাবার ছাত্র গিরিনকাকুর সঙ্গে শুল্লো থাকতে। তখনো ১৯৫০।

কী করে লিখি যে, পৃথিবীর সব সহবাস দেখা যায়, ঐ সহবাস দেখা যায় না। আঃ, বুক কেবল পুড়ে থাকে হয়ে যায়। সব বেগুনী হয়ে যায়, মনে হয়, কাঁটার মুকুট পরেছি, তিনবার পড়ে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে পালাতে। মনে হয় ডানকাঁধে ক্রুশ, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ।

তখন থেকেই ক্রমে ঈশ্বরে আমার আর মতি থাকে না। ক্রমে ঐ ঈশ্বর এক মহান কল্পনা, এই কেবল টের পাই। টের পাই, আজ এই ধ্বংসমত্ত অন্ধকার ভেদ করে বিদ্যুতের মত মা যে শরীর নিয়ে রয়ে গেছেন, সেই কথা সময়ের মনে জানানোর আধার একজন পুরুষের নির্জন শরীরে একটি পলক শব্দ—হৃদয়বিহীন সব অপার আলোক-বর্ষ ঘিরে ॥

অর্থাৎ বস্তুত, অন্ধকার নেই। চতুর্দিকে আলোকবর্ষ। হৃদয়বিহীন অপার আলোক-বর্ষ। আলোকবর্ষ অর্থাৎ বস্তুত অন্ধকার নেই ॥

গিরিনকাকু যদি আমার জন্য কোনো গল্পের বই কিনে দিতেন তখন আমি তা ঐ কারে বসে কুটিকুটি করে ছিঁড়ি। সেখানে যজ্ঞের বালি রাখার কড়াই আছে। বস্তুতঃ

সেই অগ্নিদগ্ধ বালি, ভস্ম তখনো আছে। তার কদিন আগেই মহালয়া গেল। ঐদিন পিতৃতপর্ণে যজ্ঞ হয়েছিল, বাবা করেছিলেন তপর্ণ। বলাবাহুল্য ঠাকুরদার উদ্দেশে। ঐ যজ্ঞাবশেষ এখনো আছে কড়াইতে। ফেলে দিতে নেই। পরবর্তী যজ্ঞ পর্যন্ত থাকবে। সেখানে পদ্মাতাম ঐ বই, তার এক পৃষ্ঠাতেও চোখ না বুলিয়ে। এভাবে পদ্মি়য়েছি, ভাবলে গ্যা শিউরে ওঠে এখন, এভাবে পদ্মি়য়েছি দেব সাহিত্য কুটীরের “বিশ্ব পরিচয়”, বস্কমচন্দ্রের “আনন্দমঠ”, “শেক্সপীয়রের গল্প” (চার্লস ল্যাম্বের অনুবাদ), রবীন্দ্রনাথের “গল্পগদ্য”, “গীতাঞ্জলী”, বাংলা “থ্রি-মাস্কটিয়াস”, “টাওয়ার অব লন্ডন”, বিভূতিভূষণের “পথের পাঁচালী”, সতীনাথ ভাদুড়ীর “জাগরী”, হৈলোক্যনাথের “ডব্লিউচারিত” বিদ্যাসাগরের “প্রান্তিবিলাস”, “শকুন্তলা”, আর কত নাম করব, মানুষ হবার ঐসব গ্রন্থগুলি গিরিনকাকুর মার বৃকে হাত দেয়া হাতে আমাকে উপহার দিয়েছিলেন, উপহার অথবা উৎকোচ, তাই পদ্মি়য়েছি।

এখনো বৃকের ভিতর ঐ অগ্নি জ্বলে।

অথচ চতুর্দিকে, বলা বাহুল্য, নীল লবণাক্ত সাগর ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

চারিদিকে সৃজনের অন্ধকার রয়ে গেছে, নারি !

এখন পর্যন্ত একটি কথাও আমি লুকাইনি। দেখাই যাক না, সত্য কথা বলতে বলতে, সত্যের নির্মম কোমল, বৈধ-অবৈধ শরীর দেখতে দেখতে, দেখা যাক, পৃথিবীর ঘাস, সৃষ্টির বিষের বিস্মদ আর নিষ্পেষিত মনুষ্যতার আধারের থেকে আনে কী করে যে সূর্যে সূর্যে চলি, মহানীলাকাশ ! ভাবা যাক—ভাবা যাক—ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দগ্ধের খনি ভেদ করে শোনা যায় শব্দশ্রুবার মতো শতশত শতজলঝর্ণায় ধ্বনি।

হল কী, ঐ ১৯৫০ থেকে, বেশ কিছুকাল, ১৯৫১-র শারদীয় পূজো পর্যন্ত ঐ মা আনন্দময়ীর শব্দশ্রুবার ঝর্ণা নামল আমার বৃকে।

সেই সময়, উল্লেখ করিনি তেমন, ঐ পিশিয়ার আমার কানে কানে, ‘ও তো তোর সংমা’ বলার পর থেকে আমি বারে-বারে অজ্ঞান হয়ে যেতাম।

আমার এপিলেপ্সি আছে।

এ নিয়ে এখনই যা লেখার লিখি।

আমার এপিলেপ্সির বাহ্যিক কারণ আমার মা। আন্তরিক কারণ আজও জানিনা তেমন। তো ঐ বাহ্যিক কারণই কিছু বলা যাক।

আমার যখন তিনমাস বয়স, তখন মা আমাকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন। সবে তখন তিনি রান্নাঘর থেকে ফিরেছেন। কোনোমতে মাছের ঝোল নামিয়ে। আমি নাকি খুব কাঁদছিলাম, তাই। এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে দুধ খাওয়ানো। আর আমার

কান্নার মধ্যে দৃষ্টি খাওয়া। আমিও নাকি হাঁপাচ্ছিলাম তথৈবচ। মা আমাকে দৃষ্টি খাওয়াতেই পারছিলেন না। এ বুক-ও বুক করে কোনো বুকেই নাকি দৃষ্টি দিচ্ছিলাম না আমি। মা কার প্রতি রেগে কে জানে, সংসারের প্রতিই হবে, যে সংসার মাকে নিয়ে যাচ্ছিল আমার থেকে দূরে, ঐ সংসার, যে সংসারে মার দায় ছিল আমিষ ঘরে ভাত করা আর মাছের ঝোল করা। পাশে বসে দিলালী গল্পে মেতে ওঠা আমার ছোটো পিশিমা, একটু যদি মার হাত থেকে ঐ দায় ক্ষমা-ঘেন্না করেও নিয়ে নিতেন, তাহলে আমি কান্নার সঙ্গে সঙ্গে, আমার মা কাছে আসতে পারতেন। অমন কাণ্ড ঘটত না তাহলে। সমানে তখন ছোটো পিশি, ‘খোকন কে’দে সারা হল, যাও শিগগির’, বলতে বলতেও একবারের তরেও বলেননি, ‘যাও, আমি দেখছি’। মা তাতে রেগে আরও দেরি করছিলেন ঝোল ফোটাতে, এতক্ষণে আমার যা হবার হয়ে গেছে, আমি কে’দে সারা হচ্ছি, একবার টাশ লেগেও গিয়েছিল নাকি, মা তখন ধপাস করে মাছের ঝোলের কড়াই মেঝেতে নামিয়ে দে ছুট।

শেষরক্ষা হয়নি। মা তখন রেগে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন বিছানায়। আর কী যে হল, আমি ঐ নিক্ষেপে বিছানা থেকে গাড়িয়ে পড়লাম মেঝেতে। পড়েই নাকি অজ্ঞান। সে জ্ঞান ফিরেছিল নাকি ৭২ ঘণ্টা পর। আমার নাকি প্রচণ্ড জ্বর হয়েছিল। ১০৫°। সঙ্গে তড়কা। কনভালসন। আর ঐ কনভালসনই ক্রমান্বয়ে এপিলেপটিক ফিটে যায়।

যত বয়স বাড়তে লাগল, তত একটা অ্যাটাকের পর অপর অ্যাটাকের ইন্টারভেল বাড়ল। কিন্তু অ্যাটাক ম্যাসিভ হতে লাগল।

বাবা আমাকে ডাঃ বিধান রায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। তখন ১৯৬০, জানুয়ারি। মনে আছে, বিধান রায়ের সেই মৃদু। ভারি লেন্সের চশমা। আড়ুণ্ট কথা। খেই হারিয়ে যাচ্ছে কথা বলতে গিয়ে। কিন্তু দেখামাত্র বলে দিলেন এপিলেপসি।

প্রেস্ক্রিপশন হল গার্ডিনাল ট্যাবলেট। ও কাঁচা-কচি বাঁধাকপি রস।

গার্ডিনাল চলত। তবে বাঁধাকপির রস চলত না। ওটা হয়ে উঠত না। ঐ বাঁধাকপি রোজ কেনা আর রস করা, হয়ে উঠত না। গার্ডিনালেই কন্ট্রোল করা যাচ্ছিল দেখে ঐ বাঁধাকপি বাদ পড়ে যায়।

ঐ বাঁধাকপি মা আনন্দময়ী আমাকে টানা দু বছর ধরে খাওয়ান আর তাতেই আমি ভালো হই।

ভালো হই, ঐ বাঁধাকপিতে না ঐ মা আনন্দময়ীর নার্সিং-এ, হলফ করে বলতে পারি না। মোট কথা, এখন জেনোছি, মস্তিস্কের রোগ এটা। মস্তিস্কের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় কী পরিমাণ রক্ত বাহিত হচ্ছে বা জৈব রাসায়নিক বিপাকীয় ক্রিয়ায় কতটা গ্লুকোজ/অক্সিজেনের ব্যবহার ঘটছে—এর উপর নির্ভর করছে আমার সুখ-অসুখ।

আমাদের স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি, বোধশক্তি, মানসিক ভারসাম্য কোথায়/কোন কোন জায়গায় থাকে এবং কীভাবেই বা সমন্বয়মতো এদের ব্যবহার করে পরিবেশ/সমাজের সঙ্গে

আমরা খাপ খাইয়ে চলতে পারি—আবার কীভাবেই বা এই শক্তি হঠাৎ মস্তিস্কের মধ্যে দুর্বল হয়ে আসে বা লোপ পায়—যার ফলে আমরা সমাজের সঙ্গে মানিয়ে চলার শক্তি হারাই—আমি পড়ে দেখেছি, এ-সব প্রশ্ন আর রূপকথার গল্পের মতো রহস্য-ঘেরা নয়—আজ চিকিৎসা-বিজ্ঞান এ-সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে ও আরোগ্যের ইংগিত জানাচ্ছে।

আমাকে অনেকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, বিশেষত আমাদের হাউস ফিজিশিয়ান, যদিও অ্যাটাক হয় না এখন, তবু এপিলেপটিক সিম্পটম ব্রেনে এখনো ডরম্যান্ট কিনা জানার জন্য পজিট্রন এমিশন টমোগ্রাফি (PET) করা দরকার। ঐ Test-এ ধরা পড়বে, কী পজিশন। বম্বেতে হয়।

যাইনি।

আমি যেমন অকাল্ট সায়েন্সে বিশ্বাসী, এই সেদিনও আমার আঙুলে ছিল ১০ রতির গোমেদ, তেমনি আমি বাবা লোকনাথ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, সারদা মায়ের বিশ্বাসী, আমার বড় ভালো লাগে ট্রেলিংস্বামীকে, যিনি নদ'মার জল ও গংগার পবিত্র প্যাপহরণকারী জলকে আইডেনটিক্যাল ভেবেছিলেন; আবার তেমনি আমি বিজ্ঞানমনস্কও। বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে আমি মানি, আমার পজিট্রন এমিশন টমোগ্রাফি করা দরকার। এখন অ্যাটাক না হলেও পূর্বে যে দৃশ্য দেখতাম, এখনো মাঝে-মাঝে তা দেখি, রেকভারি হলেও যে কোনো সময় যে কোনো মূহুর্তে রিলাপ্স করতে পারে।

কিন্তু আমার যাবার ইচ্ছে নেই ঐ ব্যাপারে। বম্বে যদি যাই, তাহলে গোয়ায় যাব, 'মন্না বড়া পেয়ারা' গান শুনব, তার গোয়ানিজ ভাষা মনে নেই, বাসু ভট্টাচার্য জানে ভালো, সেও তো বম্বেতে। কিন্তু বম্বেতে ঐ PET করতে যাব, এ অসম্ভব।

কেননা, লিখতে লজ্জা নেই, আমি এপিলেপ্সি ফের চাই। To take hold of my sick nervous system. সে আমাকে অনেক দিয়েছে। আমার নির্মোহ একাকীত্ব, আমার প্রবল যৌনতা, আমার যৌন ঈর্ষা, আমার স্মৃতিভ্রংশ, আমার দিব্যস্বপ্ন, আমার গোপনতা, এবং Secret system by which I am enabled to escape to the underground.

দিব্যস্বপ্নে কত কী দেখেছি।

দেখেছি, আমার মনের মানুষকে, যে কেবল, পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইংগিতে। দেখেছি, গোধূলির রং লেগে অশ্বখ বটের পাতা হতেছে নরম। খয়েরী শালিখগলুলো, দেখেছি, খেলছে বাতাবী গাছে—তাদের পেটের শাদারোম, দেখেছি, সবুজ পাতার নীচে ঢাকা পড়ে একবার পলকেই বার হয়ে আসে। তারা সব ক্রমে হলদুদ পাতার কোলে কে'পে কে'পে মূছে যায় সম্ভ্যার বাতাসে। এও দেখেছি, কারদুর না কারদুর গোরদুর গাড়ি রয়ে গেছে ঘাসে ঐ পাখা মেলে ফড়িঙের মত। হরিণী রয়েছে বসে নিজের শিশুর পাশে বড় চোখ মেলে। আঁকা-বাঁকা শিং ছুঁয়ে তাদের মেরদুন গোধূলির মেঘগলুলো লেগে আছে।

দেখেছি, রাত্রির দানবীকে, যার মাথা নেই, তথাগত বন্ধ নেই। দ্ব-বাহু কর্তিত। আমি

যেন তার অতিকায় উদর বিদীর্ণ করে এসেছি, আমার অধোদেহে দেখি তার লালাময় নাড়ি। আমার শরুও শরুকিয়ে যায়।

আকাশে অনেক তারা দেখি, দিব্যর,...আমি মরে গিয়ে ভস্মীভূত হয়ে গেলে ওইসব তারাদের কাছে চলে যাব। এই পৃথিবীতে আর না থাকাই ভালো। তার চেয়ে বেশী আনন্দদায়ক ওই মহাশূন্যে ঘোরা। পৃথিবীও এককালে একটি তারাই নাকি ছিল। অন্তত তারার মধ্যে তো ছিলই।

এখন আর ঐ দিব্যস্বপ্ন দেখি না। স্মৃতিতে চোরকাটার মতো লেগে আছে ঐ সব দৃশ্য। কে হয়, হারাতে চায়, স্মৃতি। স্মৃতি যে সততই সুখের।

—না, আমি যাব না বোস্বাই।

—আমি তোকে নিয়ে যাব।

—না, আমি যদি একেবারে ভালো হয়ে যাই—তুমি আর আসবে না আমার কাছে।

—কেন এই যে আসি আজকাল।

—সে তো, অনেক লবণ ষেটে।

—আসি তো!

—এখনো যে ভাবনা তোমার, তাই আস। একেবারে ভালো হয়ে গেলে তুমি ফিরে যাবে আবার ঐ কুচবিহারে।

—দূর পাগল! জানিস না, আমি রিটারার করেছি।

—বাড়টা তো আছে, মরতে বাড়ি করতে গেলে কেন? বেশ তো ছিল ঐ কোয়ার্টার্স।

—তা রিটারার করে থাকতাম কোথায়?

—কেন আমার কাছে?

—তোর বউ আছে না?

—একসঙ্গেই থাকতে।

—সে থাকা যায় না। তুই ভালো হলে আমি শান্তিতে মরতে পারি।

—না, তুমি মরবে না, আমার আগে তুমি মরবে না।

—আবার বিধবা হব বদ্বী?

হ্যাঁ, এই শেষ কথা বলেছিল মা আনন্দময়ী।

কবে যেন শূন্য করেছিলাম, মাতামহী স্নেহলতারও এক আন্ডারগ্রাউন্ড ছিল। সেই আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল আমিই দেখতে পাই নিজগুণে। অর্থাৎ মাতামহী আমাকে দেখান বিশ্বাস করে। এবং উনি বিশ্বাস করেন আমাকে। তাঁর জীবনের বড় দুটি আন্ডারগ্রাউন্ড আমি জানি। উনি যেই জানলেন, আমি জানি, অর্থাৎ আমার সঙ্গে সখ্য হয়ে গেল তাঁর। সখ্য মানে? সখ্য মানে হল বন্ধুত্ব, বৈষ্ণব মতে, ভগবানের সহিত সমপ্রাণতামূলক সম্পর্ক। আমি/মাতামহী নিমেষে সমপ্রাণ হলাম।

এখনো গা শিউরে উঠছে, সে কথা ভাবতে। কবেকার কথা, অনেক অনেকদিন আগেকার

কথা, আমি তখন সবে ক্লাস সিক্সে উঠেছি। ১৯৪৫ সবে চলে গেল। প্রমোশনের পর দিন ১৫ দিন ছুটি হল যুদ্ধের কারণে। কৃষ্ণনগর কলকাতার কাছে, পূর্বে, জাপানিরা বোমা ফেলতে পারে, এমন গুজব চারদিকে। আমরা কিন্তু জাপানিদের পক্ষে, আমরা ছড়া কাটছি প্রকাশ্যে, সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি / বোম ফেলেছে জাপানি / বোমের মধ্যে কেউতে সাপ / বৃটিশ বলে, বাপরে বাপ !

বাবা ভয়ে আমাদের পাঠিয়ে দিলেন শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি তখন নিব্দ-নিব্দ। আজকের মতো এমন রমরমা, সে তখন ছিল না। তবে শূন্য হচ্ছিল ঐ যুদ্ধের কল্যাণে। এবং দেশভাগের আগে ঐ শিলিগুড়ি, ঐ সেবক ব্রিজ, ঐ হিলকার্ট রোড, ঐ তথাকথিত নিউ জলপাইগুড়ি ওরফে শিলিগুড়ির ঐ জমজমাট জংশন-স্টেশন, এ-সব কাকপক্ষীদের টু-শব্দও ছিল না তখন। তখন শিলিগুড়ি বর্ধিষ্ণু এক গ্রাম, জলপাইগুড়ি খেয়ে নিচ্ছে তাকে। এখন হায়, শিলিগুড়িই খেয়ে নিচ্ছে জলপাইগুড়িকে। চিবিয়ে খাচ্ছে না আদর করে খাচ্ছে, গালে চুমু খেয়ে। নিজের স্টেশনকে নিউ জলপাইগুড়ি নাম দিয়ে। পরে, NJP করে এই তো সেদিন জলপাইগুড়ির নাম মুছে দিল সে। শিলিগুড়ির গর্ব করার তখন মাত্র এই, সেই একমাত্র দার্জিলিং যাবার গেটওয়ে। যতদূর মনে পড়ে, তখন সেবক ব্রিজ দেখাও ছিল এক পরম আশ্চর্য জিনিস দেখা। আর ছিল তখনি ভট্টাচীরের ভীড়। টসটসে লাল আপেলের মতো গাল তখন তাদের। কিন্তু বৃদ্ধ নেই। মোগোলয়েডদের বৃদ্ধ তেমন থাকে না, দৃষ্টি থাকে ঢের, এখন যেন অনেকটাই তারা আদি অস্ট্রিক হয়ে গেছে। এখনতো ওরা শীতের পাখির মতো আসানসোলেও আসে।

তখন এত ব্যাংকও ছিল না ঐ শিলিগুড়িতে। তবে চারু মজুমদারের বাড়ি ছিল ঐ শিলিগুড়িতেই, সেভাবে ধরতে গেলে শিলিগুড়ি তখন থেকেই ঐতিহাসিক হবার জো খুঁজছে।

এহেন শিলিগুড়িতে আমার মাতামহীর নাম ডাক ছিল খুব, চারু মজুমদারের থেকেও বেশি ঐ ১৯৪৫-এ। আমার মাতামহী ছিলেন সেই তেঁতুলপাতা, যেখানে দশজনের ঠাই হয়। অর্থাৎ মেয়ে-জামাই-নাতি-নাতনি এলে সুখী হন। মামা মন্থ বেজার করেন। কিন্তু মন্থে কিছুর বলেন না। প্রথম তিনদিন ঐ শিলিগুড়ি পেঁছে মামার আদর পাই। না, বলা ভালো, মামীমার আদর পাই। আমাদের ব্যাপারটাই উল্টো। কেননা আমাদের ছিল 'তাই তাই তাই, মামার বাড়ি যাই / মামার বাড়ি ভারি মজা, কিল চড় নাই। মামা এল ঠ্যাঙা নিয়ে পালাই পালাই।' এক মাসের বেশি থাকা যেত না। মামা একটা কিছুর প্লট করে আমাদের ভাগিয়ে দিতেন। কেবল আমাকে পারতেন না। কেননা আমি ছিলাম মাতামহীর প্রকৃত দৌহিত্র। মামাকে স্পষ্ট বলা আছে, এই নাতি থাকবে। খরচ আমার।

হ্যাঁ, আমার মাতামহীর খরচ করার মত সম্পত্তি ছিল। তাঁর পিতৃ-সম্পত্তি ছিল ঢের। তিনিই ছিলেন তাঁর পিতামাতার একমাত্র সন্তান, স্নেহলতা। কত পেয়েছিলেন দেবী-

গঞ্জের পিতৃ সম্পত্তি, আমি হিসেব করে দেখেছি। মনে রাখতে হবে, সেই ১৯৪৫-এ, মাতামহীর ইনহেরিট করা শেয়ার, সার্টিফিকেট ও ক্যাশ টাকা ছিল ২৫ হাজার। বসতিভটা বিক্রিরও প্রায় ২৫ হাজার। সংলগ্ন আম বাগান, পুকুর ও পাট ব্যবসায়ের গদ্দাম মালসমেত বিক্রির ১৭ হাজার। অর্থাৎ ৬৭ হাজার। আর কিছু লেখার দরকার নেই, কেবল এই লিখলেই চলবে যে তখন শিলিগুড়ির শ্রেষ্ঠ উত্তরবঙ্গীয় কাটারী-ভোগ আলোচালের (আতপ) মণ ছিল মাত্র ১০ টাকা। এখন লিখি, এখন ঐ কাটারী-ভোগ আতপ চালের মন ৪৬৪ টাকা (১৯৯১)। তাহলে ৬৭ হাজার কত হয় এখন? তখন মাতামহী এক টাকার রাজার মাথার রূপোর কয়েন দিলে ২০টা আমসল্দেশ তথা রাজভোগ পাওয়া যেত। যার দাম এখন ৪০ টাকা। অর্থাৎ প্রায় ৪০ গুণ।

এই টাকা দিনে দিনে বাড়ি কালকেতুর মতো, শিলিগুড়ি ইমপিরিয়াল ব্যাংকে (স্টেট ব্যাংক অধুনা) বাড়ছিল। কেউ জানতো না। এমন কি মামাও না। তখন ম্যানেজারকে অ্যাপ্রাই করলে অ্যাকাউন্ট আদ্যন্ত গোপন থাকত। ঐ ব্যাংকের চারজন ম্যানেজার, অ্যাকাউন্টেন্ট ও ক্যাশিয়ার আর চেক লেজার-কিপার ছাড়া কাকপক্ষীও টের পেত না। এখন তো সবই ঢিলেঢালা।

ব্যাংকে এই অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন তরুণদাদু। মাতামহীর খুড়তুতো দেওর। রোজ রাতে, ঐ ১৯৪৫-এ, ঐ তরুণদাদু মাতামহীর ঘরে থাকতেন গভীর রাত পর্যন্ত। তরুণ-দিদা অসামান্য সন্দ্বন্দরী ছিলেন। তাঁদের মেয়ে বার্বিল, অপরূপ রূপসী ছিলেন, আমি অমন রূপ আর দেখিনি। সে, বার্বিল একবার আমাকে তার পা দেখিয়েছিল জাঙ্গিয়া অঙ্গি। ওঃ, কি নিটোল হস্তদন্ত ছিল। মাত্র ১২ বছর বয়সে প্রথম পিরিয়ডে বর্মি করতে করতে শেষ হয়ে যায়। তো, ঐ তরুণদিদার দুগ্ধের অবধি ছিল না। অমন করুণ চোখও আমি আর দেখিনি। অনুমান করি গভীর রাত পর্যন্ত তিনি শয্যাকন্টকে এপাশ-ওপাশ করছেন। অদুরে রূপসী বার্বিল। অথবা নিদ্রাঘ জ্যোৎস্না।

অন্যদিকে ঐ তরুণদাদু মাতামহী স্নেহলতার কাছে ফিসফিস করে প্রথমে ঐ হিসেব, পরে, স্বকর্ণে শুনোঁছি কিছু, ঐ ঘরের বিশাল বিছানার একবারে অন্যধারে শুয়ে, মাঝখানে তিনজন দৌহিত্র, দৌহিত্রী। পরে যখন তরুণদাদু চলে গেলে মাতামহী আমাকে প্রস্রাব করতে ওঠাতেন (আমার তখন শয্যামুহুরোগ ছিল) তখন বাইরে থেকে ফিরে মাতামহী তাঁর পাশে শোয়াতেন আমাকে। আমার প্রথম প্রথম ঘেন্না করত। কেমন ভেজা ভেজা শীত শীত লাগত। কিছুতে তাঁর কাছাকাছি যেতে পারতাম না। ঘাড়ে নিঃশ্বাস পড়লে অস্বস্তি লাগত। কেননা, তার আগেই, ঐ তরুণদাদু, স্বকর্ণে শুনোঁছি, বলেছিলেন একদিন, প্রথম যৌদিন মাতামহীর আন্ডারগ্রাউন্ড টের পেলাম শুনোঁছি, উর্নি বলছেন, ৮০ ফোঁটা রক্তে এক ফোঁটা বীৰ্য হয়। মেয়েদের মাসিক চলে গেলে, ৫০-এর পর মাসিক নাকি বন্ধ হবেই, তখন আর সন্তান ধারণের ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু কামনা থেকে যায়।

ওঃ, কামনা যে কত বয়স পর্যন্ত থেকে যায়, এখনো সঠিক হিসেব করে উঠতে পারে না মানুষ।

তারপর স্বচক্ষে দেখেছি, মাতামহীর তলপেট অর্ধ শাড়ি তোলা শরীরের উপর ঐ ভরুণদাদু শুষে।

—তাকে আজ কিছু গোপন কথা বলব, কাউকে বলবি না, চল আমরা বাজার করার নাম করে বের হই।

১৯৫১-র কথা। তখন আমার বয়স মাত্র ১৬। দেখতে বড়। তবে রোগা। আমি তখন বয়স ভাঁড়িয়ে ভোটার। সাবালক হয়েছি। এমনতেই, সেভাবে দেখলে, আমি সাবালক। সাবালকদের যে ধরনের কনসাসনেস থাকে, আমারও তা আছে। মনে করুন, আমি তার একবছর আগে সহবাস করেছি। আর তখন থেকেই নর-নারী সম্পর্কিত খুঁটিনাটি জানি। এ জানাই ফ্রয়েড ও রাশেলের মতে, ম্যাচিউরিটি।

আমার মাতামহীর বয়স তখন সবে ৬০ পেরিয়েছে। দশ বছর হল তাঁর মেনোপজ চলছে। তাঁর মুখ থেকেই এসব শোনা। বস্তুত তাঁর কাছেই এসব শেখা। এই পিয়ারিড, মেনোপজ, রক্ত-বীৰ্য—এইসব। এ ব্যাপারে আমার শিক্ষায়ত্নী দুজন। একজন মা আনন্দময়ী, অপরজন মাতামহী স্নেহলতা। মাতামহী যেমন কেবল সম্পত্তি ও প্রবৃত্তি শিখিয়েছেন, আমার মা আনন্দময়ী তেমনি শিখিয়েছেন, আনন্দ কাকে বলে। এ দুয়ের শিক্ষায় আমি সাবালক ঐ ১৯৫১-তে। তাই জগৎ বরাট, আর. এস. পি. আমাকে যখন ভোটার হতে বলেন, আমার মনে হল না, আমি কিছু অন্যায় করেছি। আমাকে জগৎদা বলেওছিলেন, তুই অ্যাডাল্ট।

হ্যাঁ, অ্যাডাল্ট।

রিক্সায় উঠে মাতামহী বলেন, আজ তোকে তোর নতুন মাসীর বাড়ি নিয়ে যাব। ওখানে আমার সব কাগজ-পত্র আছে। তোকে দেখাব, তুই আমাকে সাহায্য করবি। হেলপ করবি। টাকা বাড়াতে হবে। রিচ হতে হবে। মাতামহী, কারণে-অকারণে ইংরেজি বলতেন। তাঁর ইংরেজি বড় অদ্ভুত ছিল, যেমন ‘অ্যানাউন্স’ কে ‘অ্যালাউন্স’ বলতেন, ‘ইনিস্ট’ কে ‘ইনছিষ্ট’ বলতেন, ‘স্লেগান’ কে ‘শ্লোক’ বলতেন ইত্যাদি। আবার সঠিকও বলতেন, যেমন ইমপিরিয়াল, ব্যাংক, ম্যানেজার, চেক, ব্যালেন্স, ইন্টারেস্ট, এমনকি ‘কালচার’ কথাটি সঠিক জায়গায় প্রয়োগ করতে পারতেন। যেমন, ‘তোর মামার কোনো কালচার নেই, এক নার্সকে নিয়ে পড়ে আছে’ কিংবা ‘এটা কালচার মন্ড্রো’ অবশ্য কালচারড্ মন্ড্রোও বলা তাঁর অসাধ্য ছিল না।

নতুন মাসী মানে, দত্তক নেয়া মাসী, যদিও মাতামহীর সম্প্রকন্যা ও এক পুত্র এখনো জীবিত। নষ্ট হয়েছে দুই কন্যা, এক পুত্র। দাদু ডাক্তার ছিলেন। মাতামহীর বৃদ্ধের দৃষ্টি থেকে, ওতে নাকি জরায়ু ভালো থাকে। এও শোনা।

এসব কথা আমাকে ঐ ১৯৫১-তেই বলে ফেলেছেন।

যখন ঐ মাসীর বাড়ি গেলাম, দেখলাম এক সর্বদা ‘মা’ ‘মা’ করা মাসীকে। আমার মা বা বাকি ছয় মাসী কখনো মাতামহীকে মা ডেকেছেন, শুনিনি। সম্বাই, আমার মামা ইস্তক ঐ তরুণদাদুর কীর্তি জানতেন। মদুখে কেউ কিছুর বলতে পারত না। কেননা মাতামহী সর্বদাই শাসাতেন, ‘জানিস তো আমি একা থাকতে পারি। আমার যা আছে, তাতে হেসেখেলে ডুগডুগি বাজিয়ে থাকতে পারি। কারুর কাছ থেকে এক কানাকড়ি না নিয়ে।’

ঐ নতুন মাসীর বর, আমার নতুন মেসো, পড়ে গিয়ে নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী ছিলেন। সংসার দেখতেন, আমার মাতামহী। আর তাঁর সংসারও ছিল এখানে। সংসার মানে মায়াবন্ধন, পার্থিব আকর্ষণ। এখানে এসে মাতামহী নিজব্যয়ে শিলিগুড়ির শ্রেষ্ঠ মিষ্টি, ক্ষীরের মালপোয়া, নিজে খেতেন, নতুন মাসীকে খাওয়াতেন, আর তাঁর ঘর-জামাইকে। ঐ নতুন মেসো, বাস্তবিক, মাতামহীর ঘর-জামাই ছিল। ঘর-জামাই, home, domestic Son-in-Law। ঐ নতুন মাসীর কোনো ছেলেপুতে ছিল না, এখানেই মাতামহীর সুখ। উনি কন্যাদের সন্তানসম্ভাবনায় কমপ্লেক্স বোধ করতেন। বারাস্তরে বলতেন, আমারই দেয়া পালংকে, আমারই দেয়া পণে, আমারই গর্ভজাত কন্যার উপর অন্য কেউ শোবে, এ সহ্য করা যায় না। তবে জামাইদের খুব যত্ন করতেন। নাতিদেরও। তারমধ্যে অবশ্যই আমি সবার সেরা প্রডিগ্যাল নাতি ছিলাম। আমি দড়িট কারণেই প্রডিগ্যাল। আমি বহুবায়ী, wasteful, এই এক; অবশ্য এটা বড় কথা না; আমি যে আবার স্বেচ্ছাচারী, এই দুই। ঐ স্বেচ্ছাচারী অর্থেই আমাকে উনি প্রডিগ্যাল বলতেন। এই শব্দ শিখেছিলেন, স্যামসন অ্যান্ড ডেলাইলা দেখে। আমি, নতুন মাসী, মাতামহী দেখেছিলাম ঐ ছবি মেঘদূত সিনেমায়। ‘প্রডিগ্যাল’ শব্দটি আমার স্বকর্ণে শোনা, ঐ ছবি দেখে। যে চুল অর্ধ কাটতো না। দাড়ি না, কিছুর না। চুল কাটলে ওর শক্তি কমে যেত, ঐ প্রডিগ্যাল স্যামসনের, আমাকে, ঐ ছবি দেখার পর থেকে বলতেন, চুল কাটাবি না। তোর শক্তি অক্ষয় থাকলে, আমার ভাবনা নেই। আমার অ্যাকাউন্ট থেকে তুই বদ্বন্ধি করে টাকা তুলবি আর খাটাবি। এক আনা তোর।

এক আনা মানে জানেন? ধরুন মাতামহী যদি হাজার টাকা তোলেন, তার এক আনা হল, হাজার আনা, অর্থাৎ ৬২ টাকা আট আনা, আর ৬২ টাকা আট আনা মানে হল, ৪ (চার) মণের বেশি কাটারিভোগ আতপ চাল কেনা ঐ ১৯৫১-তে। এখনকার আড়াই হাজার টাকা। ভাবা যায়?

—আচ্ছা, তরুণদাদু এখন কোথায়?

—ভাগলপুত্রে।

—কেন?

—তোর মামা তাড়িয়ে দিয়েছে।

—কেন?

—তোর মামা সন্দেহ করত।

—কি সন্দেহ?

—ঐ টাকাকড়ি।

—আর কিছু?

—আর আবার কি থাকবে?

আমি আর পারলাম না, বলতে বাধ্য হলো, কেন ঐ ৮০ ফোঁটা রক্তে যে এক ফোঁটা বীৰ্য হয়, আমি জানি কিন্তু।

—জানিস? তাহলে তখন ডুবে ডুবে জল খেঁত।

—আমি যে প্রডিগ্যাল।

—কাউকে বলিস না কিন্তু, তোকেই আমার সব সম্পত্তি দিয়ে যাব।

দিয়ে যান নি। তাঁর মৃত্যুর পর কিছু আর অবশিষ্ট থাকেনি। আমার মাতামহীই যে আদ্যন্ত প্রডিগ্যাল ছিলেন।

স্নেহলতার কথা^১

আনন্দময়ীকে আমার মাতামহী স্নেহলতার কথা বিস্তর বলেছি, কেননা এই আনন্দময়ী ব্যতিরেকে আমার জীবনে ঐ স্নেহলতা কম প্রভাব ফেলেননি। আমার অবদমিত মনকে উনিই প্রথম সারফেসে নিয়ে আসেন নিজ গুণে, আমাকে অভয়দান করেন। বলা যায়, উনিই উসকে দেন আমার অবদমন। উনিই আমার নেসেসিটি, প্রয়োজন, ইত্যাদিকে রিকগনাইজ করেন—তথা স্বীকৃতি দেন। অর্থাৎ ফিল্ডম দেন।

ওনার প্রডিগ্যাল চরিত্র একদিনের বাজার করা দেখলেই মালুম হয়। একদিন ঐ দস্তক মাসী, আমি, আর ঐ মাতামহী স্নেহলতা তখনকার শিলিগুড়ি বাজারে যাই। যেখানে এখন স্মাগল্‌ড গুডসের বাজার, তার কাছেই ছিল তখনকার শিলিগুড়ি বাজার। ঐ তথাকথিত হিলকার্ট রোডের পাশে। তখন সবে কাঁসার বাসনের গুরুত্ব কমছে। কাচের বাসন, অ্যালুমিনিয়াম বাসন ও স্টেনলেস স্টিলের বাসন উর্কি মারছে। উনি করলেন কি কাচের বাসন এক সেট, ডিনার সেটসহ, এবং স্টেনলেস স্টিলের বাসন এক সেট, সেও ডিনার সেটসহ কিনলেন। সে, প্রায়, তখনকার যুগে, সাতশ টাকা লেগেছিল মনে আছে। নিয়ে দস্তক মাসীর বাড়িতে সব মজুত করে, জানালেন, এবার ডাইনিং টেবিল-চেয়ার হবে, অর্ডার দিয়েছি। এলে, আমরা একদিন, এই বাড়িতে ডিনার খাব। এই রকম প্রডিগ্যাল ছিলেন তিনি।

অবশ্য, এ-সব কথা যখন জানিয়েছি আমার আনন্দময়ীকে, যিনি প্র্যাকটিক্যালি আমার

১. এভাবে ডাইনীতে এটাই একমাত্র সাব-টাইটেল। কেন সে করল অনুমান করতে পারি। এই স্নেহলতার কথাই সবার আগে আসা উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু আনন্দময়ীর কথা বলতেই যেন তাঁর আগ্রহে ঘেঁষে স্নেহলতা ক্রোনোলজিক্যালি আসেননি। প্রসঙ্গত জানাই—ডাইরীর যে পাতা থেকে লেখা শুরু, সে পাতায় ‘আমি এখন আগারগাউণ্ডে’ টাইটেলের নীচে খুব ক্ষুদ্র অক্ষরে, ঐ মার্জিনে, স্মরণ করে ১৮ বার আনন্দময়ী লেখা। কেন ১৮ বার বুঝি আজও।

কাছে চলমান ডিকশনারি, যেমন ছিলেন, যদি বড়তেই দেই ছোটর উপমা, তাহলে বলতেই হয়, যেমন ছিলেন ভাষাবিদ সুকুমার সেন, আর রবীন্দ্র মিউজিয়মের কিউরেটর শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, যারা উভয়েই রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে চলমান ডিকশনারি। তেমন চলমান আমাকে জানিয়েছেন, যদিও প্রডিগ্যাল শব্দটি হঠাৎ মনে হতে পারে বড় স্বেচ্ছাচারী, তাহলেও এই প্রডিগ্যালেরও পজিটিভ দিক আছে অভিধানে। যেমন, Nature is prodigal of her gifts...a man who gives prodigally to charities...এ সবই in a good sense...bad sense এ তো আছেই যে, extravagance, wasteful, spending...তোর দিদিমা হয়ত দুই-ই।

হ্যাঁ সত্যিই, মাতামহী স্নেহলতা দুই অর্থেই প্রডিগ্যাল। আমাকে স্বাধীনতা দেবার ব্যাপারেও প্রডিগ্যাল।

সেটা অবশ্য আমি ১৯৫৬-তে বন্ধ। যখন আমি এম. এ. পাড়ি কোলকাতায়।

এবং আমার যখন সিক্স্‌থ-ইয়ার, বাংলায়।

তখন উনি একবার কোলকাতায় আসেন। এবং তাঁর আত্মীয়গৃহ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব রোডে ওঠেন। আমাকে হস্টেল থেকে চিঠি লিখে, সেখানে আনিয়ে জানান, আমাকে তুই কয়েক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবি। যাই।

প্রথমে এক সিনেমা, অঙ্গনগড়, সুবোধ ঘোষের গল্প ‘ফসিল’ অবলম্বনে এক মন্ডি। দেখলাম ভবানীপুত্রের রূপালিতে। সিনেমা দেখে ফেরার পথে ব্লেন, দেখালি তো সুন্দর ব্যানার্জির সঙ্গে রাজা মুখার্জির ভালোবাসা। ঐ ভালোবাসা খুব ভালো। কেননা, ভালোবাসা হল, সামাজিক কাজে একত্রে চলতে গিয়ে। ভালোবাসা যদি হয় সজ্জন, তাহলে তেঁতুল পাতায় দশজনের সঙ্গেও ভালোবাসা চলে। এ ভালোবাসা নষ্ট হয় না। নষ্ট হয় যদি ভালোবাসা কেবল আমাতে-দেওরে হয়, যা অবৈধ বলে কাউকে বলা যায় না, ছেলেমেয়েদের কাছেও লুকোতে হয়। এমনকি ছেলেমেয়েরা যখন মা-বাপ হচ্ছে, তখনো যা চলে গোপনে। এ ভালোবাসা কেবল গায়ে-গতরে বাড়ে। তাই গায়ে-গতরে ঘৃণ ধরলে ঐ ভালোবাসাতেও ঘৃণ ধরে। তুই যদি ভালোবাসিস, তাহলে ঐরকম সামাজিক কর্মের মধ্যে যে ভালোবাসা হবে, তাকেই ভালোবাসবি কেবল।

কথা রাখতে পারি না। আমিও ঐ তথাকথিত অটোনমাস তথা ব্যক্তিগত ভালোবাসায় যাই আর সমূহ বিপদে পাড়ি। কিন্তু সে কথা পরে।

আগে-ভাগে বলে রাখি, আমার মাতামহী, ঐ বেড়াবার ঝোঁকে আমাকে বলেছিলেন, যা কিছু নিষিদ্ধ, তুই অবোধে তাই কর—আমি পাশে থাকব, বল তোর কি ইচ্ছে! আমি তোর ইচ্ছে দেখব।

আমি বলি, আমি গোমাংস খাব। অবোধে। লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়। উনি রাজি হন। আমরা ‘নিজামে’ যাই। বিফ-রোল খাই ঐ ১৯৫৬-তে। তখনো রোল এমন জনপ্রিয় হয়নি। ওনার সঙ্গে আর্মিনিয়াতেও যাই। সেখানে আর্মিনিয়া স্পেশাল খাই। সেদিন

এক অঘটন ঘটে। ওঁর পরনে ছিল গরদের শাড়ি ও গরদের চাদর গায়ে। তখন শীত আসি-আসি করছে। আমার বেপরোয়া মাংস খাওয়া তিলক কাটা মাতামহীর কাছে, স্বভাবতই ব্যস্তবাগীশ হয়—তাতে ঝোল ছিটকে পড়ে মাতামহীর গরদের চাদরে। উনি হাসেন। বলেন কেবল, দেখালি তো, অবাধ ইচ্ছের উচ্ছ্রষ্ট ছিটেফোঁটা অন্যের গায়েও লাগে। এখন তোর বিচার, তোর ইচ্ছেগদূলি কতটা অবাধ করবি, যাতে তার উচ্ছ্রষ্ট অনিচ্ছাকের গায়ে না লাগে। আমি কিন্তু ইচ্ছুক, তোর ইচ্ছেগদূলি অবাধ হোক।

তোর দাদুর মৃত্যুর পর, মনে আছে, তোরা যখন এলি, তখন শেষরাত, বারান্দায় দাদুর মৃতদেহ, অগুরু ছিটানো হচ্ছে কেবল, ধূপধুনো, ফুল, তোর দাদু বেলফুল ভালোবাসতেন, সারাদেহ তোর ছোটমাসী বেলফুল দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল, মনে আছে? তুই ঝাঁপিয়ে এলি আমার কোলে। মনে আছে? তুই আমার বুকে মুখ রেখে গুমরে গুমরে কাঁদলি। আমার কান্না মূছে গেল। কি নিয়ে বাঁচব, তার হৃদিশ হল, আমার কোল জুড়ে তুই এলি। মনে আছে?

তারপর, তখনো, আমার মাসিক বন্ধ হয়নি। ভেবে দেখ, তখন মাত্র ৪৯। ১৯ বছর থেকে মা হাঁছি প্রায় প্রতি বছর। নটি সন্তান পেতে ধরোছি। দেখাবি তলপেট একটুও কঁচকায়নি। আমার বুকোও বলি পড়িনি।

তোর দাদুর মৃত্যুবার্ষিকীতে ঐ যে শেষ মাসিক হল আমার। আর হ'ল না। ৩/৪ বার ভিজে গেছে, রক্ত ঝরেনি।

ঐ সময় তোর তরুণদাদু আমাদের বাড়িতে থাকতে লাগলেন সপরিবারে। কুর্চাবহারের বাস উঠিয়ে রিটার্নার করে এসেছেন মাত্র ৪৫-এ। টি. বি. হয়েছিল। অবশ্য এই শিলিগুড়ির বাড়িতে তাদেরও অংশ ছিল।

দুর্দিনে বন্ধ হয়ে গেল তোর তরুণদাদু। আপাদমস্তকে দেওর, দ্বিতীয় বর। কত কিছু শিখলাম তার কাছে। ছেলেমেয়ে বিয়োবার সময় তোর ডাক্তার দাদুর কাছে কিছুই শুনিনি। কিছু প্রশ্ন করলেই বলতেন, তোমার এ-সব ডাক্তারি কথা শুনো কি হবে? তুমি কি ডাক্তার?

—অন্তত ডাক্তারের বোঁ তো!

—হ্যাঁ, বোঁ শূন্য।

তোর তরুণদাদু বোঝালেন, মেয়েরা শূন্য বোঁ না, মেয়ে না, শাশুড়ি না, বোন না, মেয়েরা হল মানুষ।

ঐ মানুষকে গড় করত সে।

আমার পা দুটো শিউরে উঠত।

যেদিন মাসিক বন্ধের জ্ঞান পেলাম; সেদিন খুব বৃষ্টি হাঁছিল। ঘরে আমি আর সে। ঘরটা যে বড় ঘরের সংলগ্ন, সেখানেও কেউ ছিল না। বারান্দাতেও কেউ ছিল না। আর সব ঘর তো উঠান পেরিয়ে, ঐ তুমুল বৃষ্টিতে, যে-যার ঘরে।

তোর তরুণদাদা বোঝালেন, মাসিক বন্ধ হলে মা হওয়া যায় না বটে কিন্তু কামনা যায় না।

আর শুনবি?

তারপর থেকে কি হল জানিস, নতুন করে যেন সূর্য উঠল। নতুন করে আমার দেহে রক্ত এল। রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে আমি আরও রক্তাক্ত হলাম। ও সে যে কি কাঁপুনি, তোকে কি বলব! তখন আমার মনের বনে বাঁশ ও ঘাস ছাড়া, যার ভেতরে একটু সার আছে, সেই চন্দন হয়ে গেল।

এই স্নেহলতা মারা গেলেন ১৯৬০-এ।

দৌহিত্র হিসেবে পারলৌকিক ক্রিয়ায় আমি নিজের অজান্তে পদবী বলার সময় স্নেহলতার পিতৃদত্ত ‘দত্ত’ ব্রহ্মাম, স্বামীদত্ত ভৌমিক ব্রহ্মাম না।

স্নেহলতা দত্ত নামে তাঁর আত্মার, শান্তি কামনা করলাম। এও সম্ভবত তাঁরই কৃপা। অথবা তাঁরই নির্দেশ। আমার অবদমিত অভীষা।

তাঁর শেষ কথা ছিল, সবই করবি, কাউকে কষ্ট দিবি না। ভোগ করবি গায়ে আঁচ লাগতে দিবি না। বাসনার সাগরে ডুববি, চুল ভেজাবি না।

কতটা পেরেছি সে কেবল জানেন আমার অন্তর্মামী, আমার মা আনন্দময়ী।

তাঁরও শেষ কথা, উঠে আর পাতাল থেকে। অনেক ঋতু কাটালি সেখানে। এবার মর্তে আয়।

মর্তে এসেছি কিনা, তারই হিসেব করতে এই দিনপঞ্জী।

তৃতীয় অধ্যায়

শীতের ঘুমের থেকে এখন বিদায় নিয়ে বাহিরের অন্ধকার রাতে

১৯৮৬-র ১৫ এপ্রিল, মা আনন্দময়ী আমার, মারা গেলেন। এই বাক্যটি যে কখনো আমাকে লিখতে হবে, স্বপ্নেও ভাবিনি। এ যাবৎ আমি যতবার আমার মৃত্যু-শয্যা চোখে দেখেছি ততবারই ঐ আনন্দময়ী আমার শয্যাপার্শ্বে। একবার তো গুঁর বুকুর উপর মাথা রেখে লোকান্তরিত হয়েছিলাম।

কী আর লিখব সে কথা, দ্বঃসংবাদ দ্রুতগতিতে আসে। দ্বঃখের যেমন ক্ষিপ্ত আক্রমণ, তেমন দ্বঃসংবাদেরও।

কোথা থেকে কোথায় ভাবুন, শিলিগুড়ি থেকে আসানসোলে। মাত্র চার ঘণ্টায়।

তখন দ্রুপদ্র, লিভিংরুমে আমি একা। মাস্টার বেডরুমে স্ত্রী। মরতে তখন আমি ক্যাসেটে শুনছি, ‘এমনি করে যায় যদি দিন যাক না...’, ঘর অন্ধকার, বাইরে লু। মাথার ওপরে পাখা ঘুরছে তখন। এমন সময় ডোর-বেল।

মা আনন্দময়ীর বলাই ছিল, আগেই, ‘আমি যদি মরি, আমার মৃতদেহ যেন ওর জন্য ধরে রাখা হয়।’ বাক্যটাকে যে কতবার কত কে আমার কানে দিল, ভাবতে গেলে দেখি,

আমি অভিনয়, সপ্তরথী বাক্য দিয়ে ঘেরা। কেবল ঐ কথা, ‘আমি যদি মরি, আমার মৃতদেহ যেন ওর জন্য ধরে রাখা হয়।’

যেন সাত-কোরােসে আনন্দময়ী বলছেন, আমি যদি মরি, আমার মৃতদেহ যেন ওর জন্য ধরে রাখা হয়।... এই বাক্য দার্শনিক কাঁপিয়ে যেন আমাকে তুলে আনল আসানসোল থেকে।

ওয়ার্ল্ডেস মেসেজ পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি জামা-কাপড় পরেছি। আর পরতে পরতে শায়িত স্ত্রীকে বলেছি। স্ত্রী অন্ধ শোকাকুল দেখি। আমার কোনো মূভমেন্টে বাধা দেবার শক্তি হারায়। আমি আমার কাঁধে ঝোলানো নীল কটস্‌উলের ব্যাগ, আনন্দময়ীরই দান, কাঁধে নিলে, সে কেবল মূখ ঘূঁরিয়ে নেয়, জানি তার কান্না পাচ্ছে শোকে ও পরাজয়ে।

—জামা-কাপড় কিছূ নিলে না যে!

—ওখানে আছে, থাকে আমার জামা-কাপড়—জানোই তো।

আর কোথাও এতটুকু সময় নষ্ট করি না। ছুটে ঘাই জি. টি. রোডে। হাত তুলে দাঁড় করাই এক রেডক্রস ছাপা অ্যামবাসেডর। সে থামে, আমি কেঁদে ফেলি। স্টেশনে যেতে, হাতে ঘড়ি নেই, থাকে না কখনো, সমানে ডাক্তারের মণিবন্ধে চোখ রেখেছি, চার মিনিট ১৯ সেকেন্ড লাগল রিজারভেশন অ্যানেকসিতে পৌঁছাতে।

ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে আরেকবার কেঁদে ফেললাম।

বাদলবাবু ভি. আই. পি. কোটা থেকে দার্জিলিং মেলের একটি সেকেন্ড ক্লাস শ্লিপার দিলেন টু টায়ারের, জানলার ধারে। তখন ঘড়িতে বিকেল ৫টা ১০। বাদলবাবু আমাকে নিয়ে গেলেন পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে, রাইট টাইমে আসছে ব্র্যাক-ডায়মন্ড। মনে পড়ে গেল, বিকেল কত কান্না যেন, সন্ধ্যা এক শুব।

ভোরে পৌঁছলাম।

দেখি আনন্দময়ী শূয়ে আছেন। বিশ্বাস হয় না। আনন্দময়ী ঐখানে শূয়ে আছেন কিনা, বন্ধে উঠতে পারি না। আনন্দময়ী চলে গেলেন অতদূর? সিঁড়ি ছাড়া? পাখিদের মতো পাখা বিনা?

অদূরে আনন্দময়ীর ভূত। ঐ জ্যামিতিক ভূত বলে, আমি তো জানিনা, আনন্দময়ী চলে গেলেন অতদূর!

ওঁর পদ্রবধু লাল চোখে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বল্লেন, ‘আপনি ছিলেন মার সব। শেষে পরশু আমার হাত ধরে বলেছিলেন, ও আমার মনের মানদুঃ। আমার স্বামী। আমার স্বপ্ন। আমি ওর মা আনন্দময়ী... আমার শূনে, শোনামাত্র, মাথায় যেন বাজ পড়েছিল। আমি এমনটা ভাবতে পারি না। ভাবতেই পারছি না, আপনার সঙ্গে মার সম্পর্ক আসলে কি! আপনাদের ছেলেকে বলতেই পারিনি এখনো। এ-সব কথা পদ্রবকে বলা যায় কি, নিজের মায়ের মদুখের এ-সব কথা, পদ্রব কোন কানে শুনবে?... আরও

বলে গেছেন মা, আপনিই যেন ওকে বিবসনা করান, আপনিই যেন ওর বন্ধু মধু, ঘি মাখান।

মধু, ঘি মাখিয়ে ছিলাম সারা দেহে, যে দেহের প্রতি রোমকূপে আমার স্পর্শ আছে সেই ১৯৫০ থেকে। কেমন যে লেগেছিল নিজের দৃঢ় হাত, লিখে বোঝাতে পারব না। এই দৃঢ় হাত এখনো আমি দেখি। এখনো, কয়েক কোটিবার ধুয়েও, আমি আমার দৃঢ় হাতে, এখনো, মধু ও ঘিয়ের অনিবার্জনীয় গন্ধ পাই।

আসানসোলে ফিরে, পুরোনো স্টেটসম্যান পড়তে গিয়ে অবাক হয়ে আরেকটি দৃষ্টিবাদের দেখি। ঐ দিন, ১৫ এপ্রিল, ১৯৮৬, আনন্দময়ীর মৃত্যুদিনে আমার প্রিয় জাঁ জেনেরও দেহান্ত হয়, নিঃসঙ্গ অবস্থায়, পারীর সাধারণ এক হোটোলে।

এও পড়ে অবাক লাগে, ঐ দিনের কাগজে, হ্যালীর ধূমকেতুও ঐ ১৫ এপ্রিল, ১৯৮৬-তে পৃথিবীর কাছে আসে।

শিলিগুড়ি থেকে ফেরার দিন, আমি যখন চুপচাপ একা আনন্দময়ীর ঘরে, তাঁর তৎকালীন প্রাক্তন সুস্থ-শয্যার উপর বসে, তখন আনন্দময়ীর পদ্রবধু আমাকে অ্যালুমিনিয়ামের ১০"×৮"-এর এক বাস্ক হাতে দেন। তালা দেয়া বাস্ক। চাবি নেই। উল্লেখ্য পদ্রবধু জানান, এ তালা আপনাকেই ভাঙতে বলে গেছেন। এর চাবি উনি যে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন, পরে নিজেই খুঁজে নাকি পান না। বাস্কের জিনিস বের করে উনি বাস্কটি এখানে রেখে যেতে বলেছেন। আরও বলেছেন, যোঁদন আপনি ফিরে যাবেন তার আগের রাত্রিতে আপনি যেন এই ঘরেই শয়ন থাকেন।

তাই শুনাই। কিন্তু ঘুম আসে না।

ঐ ১০"×৮" বাস্কের তালা ভাঙতে মোটে বেগ পেতে হয়নি। সেই কবে বলেছিলাম চুর্মকি ভালো লাগে আমার, আরো ভালো লাগে সোনালী ধাতুর ছোটো চুর্মকি, খুব ভালো লাগে যদি কোনো লাল ওড়নায় ঐ সোনালী চুর্মকি থাকে—আর যদি তুমি কখনো ঐ ওড়নায় আমার কাছে আসো, আমার সব দুঃখ চলে যাবে।

কবে কি বলেছি, নিজের ভালো মনে নেই। দেখি, সেই বাস্ক সযত্নে ভাঁজ করা লাল রেশমী ওড়না, সোনালী চুর্মকি বসানো। বাস্কের বাকি অবকাশে কেবল চুর্মকি, অজস্র সোনালী চুর্মকি।

—চুর্মকি তোর এত ভালো লাগে? আগে বলিসনি কেন?

—বল্লে কি হত?

—আমি চুর্মকি হতাম। চুর্মকি বড় হালকা জিনিস তো? তাহলে আমাকে তুলতে পারতি, আমাকে তোর বন্ধু তুলে নিতে পারতি।

—কেন, তুমি তো নিতে পার, নাও তো কত!

—তাতে কি আমরা ইচ্ছে করে না!

—বেশ, আমি তাহলে টান-টান এবং স্পন্দিত তার হই—তুমি তার উপর হেঁটে যাও সাবলীল। আমি তোমার ভার বহন করব দেখো। তার হয়ে কেবল দিনরাত আজীবন

তোমাকে আমার উপর রাখবো—তুমি তারের উপর হাঁটবে, দৌড়বে, ঘুমোবে, খাবে, জ্যোৎস্না দেখবে, নাচবে, গান গাইবে, কুসুমের মতো বসবাস করবে তারে, আমার উপর !
—আমি কি সার্কাসের ক্লাউন, জোকার ? নাকি পতঙ্গ ? আমি কি বিনোদী—মাদারি যে তোর উপর সারা জীবন খেলা দেখাবো ।

—হ্যাঁ, তুমি আমার মাদারি/মাদারি-কা-খেল/রোপট্রিক-ব্যালেন্স ।

বার্কি কথাও হয়েছিল বিস্তর । কিন্তু বার্কি কথা জাঁ জেনে বলেছিলেন ভালো । তাই লিখি ।

.....জাঁ জেনের মাদারি বৃত্তান্ত, লিখি যে, দুইজনের কথামাত্র, একজন লোহার তার অথবা আমি, আরেকজন মাদারি অথবা আনন্দময়ী । অবশ্য বিপরীতটাই সত্য, অন্তত জাঁ জেনে তাই লিখেছেন । কেননা তারই ভারবহন করে মাদারি—সেক্ষেত্রে আজীবন আনন্দময়ী আমারই তো ভারবহন করেছেন । ঘরে-বাইরে । শয্যাতেও তাই । তাহলে আমি হই মাদারি আর ঐ তার হন আমার মা আনন্দময়ী । অন্তত জাঁ জেনে আমাকে তাই জানাচ্ছেন, ‘এই প্রেম প্রায় আশাহীন, কেবল মমতায় ভরা । ঐ লোহার তারটা, তোমার আনন্দময়ী, তোমাকে বহন করার যতটা জোর তোমায় দেখাবে, ততটা প্রেমই তোমাকে ঐ লোহার তারকে, তোমার আনন্দময়ীকে, দেখাতে হবে ।

‘আমি বস্তুদের জানি । তাদের চাতুর্য, নিষ্ঠুরতা এবং কৃতজ্ঞতাকেও জানি । সেইমতো তারটা ছিল মৃত । অথবা, যদি সে, তার, তোমার প্রার্থনায় অমর্ত, বর্ধিত, অম্ব—তাহলে ঐ দেখ, সে, তার, জীবন্ত হয়ে উঠছে । এবং ঐ শোনো, সে কথা বলছে ।

‘তুমি তাকে প্রায় শরীরী ভালোবাসবে । রোজ সকালে, যেহেতু তুমি মাদারি, তোমার লীলার অন্ত নেই, তুমি স্টান্টম্যান, রেওয়াজ, অনুশীলন, চর্চার সময়, যখন সে টান-টান এবং স্পন্দিত, তখন যাও, কাছে যাও খুব, চুমু খাও । তাকে, কানে কানে বল, সে যেন তোমায় ধরে রাখে এবং সে যেন তোমার হাঁটুর পেশীর লাভণ্য ও ক্ষিপ্ততা তোমাকে দান করতে রাজী হয় । লীলা সাঙ্গ করে তাকে ধন্যবাদ জানাও, সেলাম কর, দোস্ত কো সেলাম কর । পরে যখন সে তার বাজে গুটানো আছে তখন গভীর রাতে তার সঙ্গে দেখা কর, তার গায়ে হাত বোলাও । আর মিষ্টি করে, সোহাগে, তার গালে গাল রাখ । কোনো কোনো লীলাবিলাসী স্টান্টম্যান হিংস্র হয়ে তারের উপরে দাপাদাপি করে, বলাৎকার করে, সেও অবশ্য অবাধ্য হয় তখন, অথবা তার আগের থেকেই অবাধ্য থাকে বলে ঐ কাণ্ড । কিন্তু তোমাকে চেষ্টা করে যেতেই হবে যাতে সে তোমার বশ্যতা স্বীকার করে । যদিও কোনো প্রেমেরই শেষ নেই, অথবা পরিণতি আশা করা যায় না, তবু জেনো, বশ্যতা স্বীকার করতে উভয়েই সন্নিবর্তিত হয় অথবা বশ্য হতে বড় সুখ । ‘সাবধান । লোহার তার অথবা যদি সে আনন্দময়ীর প্রতীকই হয়, তাহলেও সাবধান । জানবে সে প্যান্থার বা দর্শকদের মতো রক্ত ভালবাসে, অথবা রক্তপাত । বরং তাকে পোষ-মানাও, প্রেমে হও বলী, অথবা জয়ী ।

‘তোমার লোহার তারকে, যার উপর তুমি লীলা করছ, অর্থাৎ যে তোমাকে বহন করছে,

যে তোমার আনন্দময়ী, তাকে, তোমার নয়, তারই সবচেয়ে সুন্দর অভিব্যক্তি দিয়ে, তারই ভিতরের অভিব্যক্তি কুড়িয়ে, তারই দ্রব্য ও হৃদয় সামগ্রী দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ কর। তোমার উল্লসন, তোমার ডিগবাজি, তোমার ঐ আদি-অস্তিত্ব নাক, সকলই স্পর্শাতুর হবে, তবু তোমাকে সুস্থির তার উপর দাঁড়িয়ে সেলাম জানাতে হবে সকলকে, কেননা সকলেই তোমার ও তার প্রশংসা করছে হাততালি দিয়ে, কেননা সে তোমাকে বহন করছে হৃদয়-অস্তরে আর তুমি তার উপর নির্ভর করছ আর স্পন্দিত হচ্ছ, লীলাময় হচ্ছ, সুন্দর নৃত্য করছ, ডিগবাজি খাচ্ছ, সর্বোপরি সেলাম জানাচ্ছ তোমার এই স্নেহের জগৎকে। তুমি উজ্জ্বল বলেই অথবা তুমি তোমার আনন্দময়ীর স্নেহভাজন বলেই যে ঐসব লীলায় তুমি সক্ষম হবে তা নয়, তুমি সক্ষম হবে তার কারণ ঐ তারটা, যেটা মৃত ও মৃক ছিল, সেটা অবশেষে গান করছে, তাই।’

‘গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি। তখন তারে চিনি, তখন তারে জানি। তখন তারি আলোয় ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়। তখন যেন বাহির ছেড়ে অস্তরে মোর আসে / তখন আমার হৃদয় কাঁপে / তারই ঘাসে ঘাসে’

আমি স্পষ্ট শুনছি সেই গান, আমার মা আনন্দময়ী চিতায় শূন্যে গাইছেন। তার চারদিকের নীল শিখা, উর্ধ্ব-অধঃ নীল শিখা তথাপি নীল রুমাল নেড়ে বিদায় জানাবার ছলে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। যাব, আমি যাবই, আমি সহমরণে যাব। সহসা দেখি আগুনে পুড়ে আনন্দময়ী যেন স্ফীতকায়া, মধু ও ঘি জ্বলছে। জ্বলতে, জ্বলতে, পুড়তে পুড়তে তিনি অবিকল যেন শায়িত ধ্যানমগ্ন গৌতম বুদ্ধ। সেই প্রস্তর হাসিটি ঠোঁটে লেগে আছে, অলান।

আমাকে সেই সুবাদে আরও বিস্তৃত জানিয়েছেন জাঁ জেনে, *Le Funambule* গ্রন্থে ঐ মাদারি বৃত্তান্তে। এই সৌন্দর্য জানালেন, আমি তোমার আন্ডারগ্রাউন্ডে গোছি, তোমার গোপনতা দেখেছি, দেখেছি অজস্র নুড়। অন্ধকারে দুই পুরুষ প্রকৃতির তাড়নায় অথবা নিজেদের খেলালে, biological love, প্রবহমানতাকে কলা দেখিয়ে ঐ দেখো সমকামী হয়েছে। ঐ দেখো স্বপ্নে জাঁ জেনে, আমি আর আমার প্রেমিক পরস্পরের উপর শূন্যে আছি। ঘাম, কেরোসিন তেলের গন্ধ, কোথাও হাওয়া নেই। প্রেমিক বল্ল, একদিন স্তম্ভিত মেয়েলি পোশাক তো পরতে পার! প’রে দেখেছি কতবার, পোশাক পরলেই আমার ঘাম হয়, আমাকে দেখতে কুশী লাগে, আমার লজ্জা করে, যে কোনো পোশাক পরতে। পিঁপড়ে অন্ধ আমাকে ঠাট্টা করে, ও বলে, দুর্নিয়াকে দেখো, তুমি কি সৃষ্টিছাড়া গো, ধড়াচুড়া পরে কি যে কিম্বদন্তি হয়েছে যাও আয়না গিয়ে একবার দেখো—আর কাউকে দেখেছ, অমন করে ঢাকতে নিজেকে? বাবু প্রজাপতি অন্ধ অদ্যাপি ধূতি-পাঞ্জাবী পরেনি। ঐ দেখো, কি সুন্দর নগ্ন সারঙ্গ। ঐ দেখো বিবসনা কোকিলা, ময়ূরী, চিতা। ঐ দেখো নগ্ন নির্জন সাপ। কতবার তাই আমি সাগরে ভাসাই আমার পোশাক, যাহার কূল আমি নাই জানি।

একদিন তোমার ঐ আন্ডারগ্রাউন্ডে পেলাম এক টুকরো কাগজ।

‘যার ওপরে অন্তর্ভুক্ত চিহ্ন আঁকা। একটা সোজা লাইন, যেটা তারের তথা আনন্দ-ময়ীর সরলচিহ্ন। তার উপর ডানদিকে বাঁকা দাগ আর বাঁদিকে সোজা দাগ। এ-সবই তার পা। অথবা বলা যায়, তার পা ফেলার জায়গা। এইভাবে সে পা ফেলবে। আর ঐ দাগের পাশে একটা করে ফিগার, সংখ্যা। কারণ একটা শিল্প, তা ভালোবাসাও হতে পারে, আবার গানও হতে পারে, এক্ষেত্রে লীলাখেলা, যা সে এলোমেলো ও বাস্তবিকভাবে কাজ চালানোর জন্য ট্রেনিং নিয়েছে, এবং সেই ট্রেনিং-এ যে অনুশীলন ও ডিসিপ্লিন আরোপ করবার জন্য খাটছে এত, সে শেষ পর্যন্ত জিতবে। সে (ইমানুয়েল কান্ট) পড়ুক আর না পড়ুক, (পিওর রিজন আর প্র্যাকটিক্যাল রিজন সম্পর্কে তার কোথাও না কোথাও প্রত্যয় রয়ে যাবে, অন্তত আবহ থাকবেই) তাতে কি এসে যায়? তাল ও লয় গোণবার পক্ষে সে ঐসব চিহ্ন, রেখা, অক্ষর, সর্বোপরি ঐ সংখ্যাকে সে ভালোই জানে। অর্থাৎ সে ঐ আনন্দময়ী তারের জন্য কাষ’ত শিল্পী। সে কৌশলী নয়, সে কৌশলী ব্যবসাদার জোয়ানোভিসিও (অর্থাৎ বনোয়ারিলাল ভালোটিয়া) নয়, যে বস্তুত ক-অক্ষর গোমাংস, অথবা আমাদের কোনো একটা যুদ্ধের সময়—কালোবাজারী করে কোটিপতি হয়েছিল, (যেমন স্দমন, শংকর, স্দনীল) তেমন নয়। সে যদিও মৃত্যুর মতো নিঃসঙ্গ, তবু সে, তুমি, যে কোনো ধাপিতে আঙা মারতে পার অথবা যার তার সঙ্গে মাল, মদ্যপান, ইত্যাদি করতে পার। কিন্তু এ জেনো, দেবদূত এন্তেলা পাঠাচ্ছে, (আনন্দময়ীর মাধ্যমে?) তোমাকেই অভ্যর্থনা করবার জন্য, ‘একা থাক’, এই বাক্যে। কটা চোখের মত নিঃসন্দ তোমার একাকীত্ব উজ্জ্বল হল তাই। আর লক্ষ লক্ষ চোখের অন্ধকার দিয়ে তৈরি চোখগুলো তোমার বিচার করে, সন্দেহ করে, তোমার পতনের আশায় থাকে, (তোমার ডিপ্রেসনে খুঁশি হয়), কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। তুমি মরুভূমির মতো নিঃসঙ্গতার উপর অর্থাৎ এবং তার মধ্যে নাচবে। চোখ বেঁধে, যদি পার চোখের পাতা বন্ধ করে, চোখ বুজে। কিন্তু কোনো কিছুই—না হাসি, না হাততালি, শব্দমাত্র তোমার নিজের ভাবমূর্তির জন্য নাচা থেকে তোমাকে বিরত করতে পারবে না। তুমি শিল্পী, (দিনপঞ্জী লেখ, জানো যে; দিনপঞ্জী মানুষের মনের নিকটতম ভাষা)—হায়, নিজের চোখের চারপাশে গভীর খাদকে তুমি প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

‘নার্সিসাস কি নাচছে?

‘কিন্তু এটা বলতে যে ছিলনা, অহংকার ও আত্মপ্রেমকে বোঝায় তার থেকে এটা একেবারেই আলাদা জিনিস। এটা কি মূর্তিমান মৃত্যু? তাহলে একা নাচো।

‘কোথায় তোমার ক্ষত, ক্ষতটা কোথায়? (আর কারুর বৃদ্ধি আনন্দময়ী থাকে না ও চিরতরে যায় না?) আমি জানতে চাই যে সেই গোপন ক্ষতটা (তোমার স্ত্রীকে দেখিয়েছ? সে জানে?) কোথায় থাকে? কোথায় সে লুপ্তিয়ে থাকে? (আন্ডারগ্রাউন্ডে?)—যেখানে সমস্ত লোক শেলটার নেয়, যেখানে মানুষের অহংকারকে কেউ ছোঁয়, যেখানে কেউ কাউকে দেয়—সেখানে? এই ক্ষত, এতদিনে

টের পাওনি, এই ক্ষত বিবেকের বিচারালয়?.....সবাই এই ক্ষতের কাছে যেতে পারে। এই ক্ষত হয়ে উঠতে পারে, এক ধরণের গোপন ও বেদনা-কাতর হৃদয়।

‘আমরা যদি লোভী ও চঞ্চল, চকিত দৃষ্টিসম্পন্ন চলমান নারী বা পুরুষ—সকাল থেকে রাত্রি অবধি যদি কুকুর, পাখি, একটা হাটে হাঁড়ি দেখি—তাহলে এক ঝলক দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপেই আমাদের কাছে খুব পরিস্কারভাবে সেই ক্ষতটা উদঘাটিত করবে যার মধ্যে বিপদকালে তারা গুঁটিয়ে যায়।

‘কী বলছি?

‘বলছি, তারা তার মধ্যেই তার দ্বারা (ক্ষত দ্বারা) ব্যস্ত হয়ে আছে। যার রূপটি তারা নিয়েছে। এবং তার জন্যই এই রূপ, নিঃসঙ্গতা। ঐ দেখ সবকিছুই কাঁধের নমনীয়তার মধ্যে। যা দিয়ে তারা নিজেরা যা, তাই করে। তাদের সমস্ত জীবন তাদের মন্থের একটা বদমাইশ কুণ্ডনের মধ্য দিয়ে বহে চলে। যার বিরুদ্ধে তারা কিছু করতে চায় না। এবং করতে পারেও না। কারণ তারা এটার দ্বারাই এই পূর্ণ অথচ অসমঞ্জস নিঃসঙ্গতাকে জানতে পারে। হৃদয়ের এই দুর্গে (তথা আন্ডার গ্রাউন্ডে) ঐ নিঃসঙ্গতাই কেবল পরিণত হতে পারে (প্রেম পরিণত হতে পারে না, তবে মমতা পারে যা আবার নিঃসঙ্গতাকে হাইলাইটে আনতে পারে)। ঐ মাদারি (অর্থাৎ তুমি, লীলাময়ী), যার কথা আমি তোমাকে এতক্ষণ বলছি, তার করুণ চাহনিতে এটা দেখা যায় যে, তা কেবল এক দুঃখী, অবিস্মরণীয় (অথচ অনির্বচনীয়) শৈশবের ছবি ফুটিয়ে তোলে, যে শৈশবেই সে জানত যে, সে পরিত্যক্ত (অর্থাৎ তোমার গর্ভধারিণী তোমার, কার্যত, সংমা)।

‘এই ক্ষতের মধ্যে, যেটা সারে না, সেটা সে নিজেকে, (অর্থাৎ নিজেই তাই)। এবং এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে তাকে দ্রুত ঢুকে যেতে হবে। সেখানেই সে তার শিল্পের (এক্ষণে দিনপঞ্জী লেখার) প্রয়োজনীয় জোর, সাহস ও পটুত্বকে আবিষ্কার করবে।’

‘এ কথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য যে, তোমার ও তোমার আনন্দময়ীর মৃত্যু-সম্ভাবনা আছে। সার্কাসের (তথা জীবনের) নাট্যশাস্ত্র তা দাবি করে। এই খেলা—কবিতা, (আসলে কবিতাই) যুদ্ধে ও বাঁড়ের লড়াই-এর (লীলা, তথা) নিষ্ঠুর খেলা, যা পুরাকাল থেকে অদ্যাপি চলে আসছে।’

শেষ কথা জাঁ জেনে জানিয়েছেন কাল। কাল আমি শেষ রাতে অনুভব করলাম, আমি শূন্যে আছি আনন্দময়ীর ঘরে, পাশে গুঁর মৃতদেহ, মধু ও ঘি মাখানো, আমি সঙ্গম করছি আনন্দময়ীর সঙ্গে, গুঁর মৃতদেহের ছাল ছাড়িয়ে।

তখন শেষকথা জানালেন জাঁ জেনে, ‘(এতক্ষণ যা বললাম তোমাকে) এগুঁলি হল তোমার প্রতি আমার অপটু ও অপয়োজনীয় উপদেশাবলী। তুমি কেন, কেউই এ-সব অনুসরণ করতে পারবে না। কিন্তু আমি এই শিল্প, (জীবন) সম্পর্কে একটা কবিতা লিখতে চেয়েছিলাম, যার উত্তাপ তোমার (নীল হিম) গাল লাল করে দেবে—এই কেবল আমি

চেয়েছিলাম ঐ কবিতা লিখে। আর কিছ্ চাইনি। তোমাকে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছি।
দোহাই বিশ্বাস কর, শিক্ষা দিতে নয়।’

আমাকে শীতঘুমে পেল।

শুয়েই থাকি সারাদিন। সারাদিন মেঘে-মেঘে বেলা হয়। বেলা যে পড়ে আসে
জলকে চল। জল আমার আনা হয় না। তুষায় ছাতি ফেটে যায়। চোখের সামনে
আনন্দময়ী জ্বলতে থাকে। চিতা বহিমান। চিতাবাঘ ঐ পাহাড়ে ছিল একদা। এখন
সে রুমাল মাত্র। নীল রুমাল। হাতছানি দিতে গিয়ে কেবল দৃশ্যের জন্ম হয়। সে
দৃশ্য ডুববে যায় দলে।

এভাবে অতিবাহিত ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৮৯।

১৯৯০-এ পঞ্চজ আসে।

—আপনি শুয়ে আছেন কেন? উঠুন। রৌদ্রে ঘুরে আসুন বান্দুপদুর। রৌদ্রে আপনি
কেবল অন্ধকার দেখছেন কেন? মনে পড়ে আপনি বিদ্যাসাগরের মুনুডপাত দেখে
অন্ধকার দেখেছিলেন। ৮ মিনিট পর আপনার সূর্য উঠেছিল। উঠুন, বেরিয়ে
পড়ুন। বন্দুকের নল থেকে একদা আপনার পায়ের বেড়ি ভেঙে চৌচির হয়েছিল।
মনে পড়ে?

শুনি আনন্দময়ী, ‘শীত ঘুমে একটা ব্যাংকেট লাগে’, ক্রমাগত বলছেন। শীতে কাঁপছে
তার কণ্ঠ। ওষ্ঠ। দলিত বুক।

আমি কন্বল ছেড়ে শয্যা ত্যাগ করলাম। বিদায় আনন্দময়ী।

দেখি, বাহিরের অন্ধকার রাতে আমি বেরিয়ে পড়েছি শীতের ঘুমের থেকে বিদায় নিয়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

ডুবল সূর্য; অন্ধকারে অন্তরালে হারিয়ে গেছে দেশ

আমি তাকে পাই না কোথাও। খুঁজি কত। মানচিত্র দেখি। ঠান্ডা ভূগোল ক্লাসে
কতবার শোনা যায়। গান শুনি। দেখি গানে সে কোনোভাবে জেগে আছে কিনা—
নেই, কোথাও নেই।

ছুটে যাই জনসভায়, ভাবি সেখানে দেখা পাই কিনা—পাই না। শব্দ তার গন্ধ থাকে।
দুধ—মাছ—সরু চালে গন্ধ থাকে। তার পদশব্দ বাজে। পায়ের ছাপ থেকে যায়
দেখি মিছিলে। ঐ শব্দ। মিছিলেও দেখি না।

মাঝে-মাঝে স্বপ্নে পাই। ভোরের সেরকম স্বপ্নে কতবার ঘুম থেকে ছুটে যাই রাস্তায়।
দেখি প্রথম ট্রাম মূছে যাবার আগে দ্বিতীয় ট্রাম এসে পড়ে।

সে আসে না ॥ □